পরিবর্তন

৯ আগসট ১৯৮০





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন ।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী : রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস
২১
সর্দার টেরর জাহাজকে এখন আক্রমণ করলে হয় না ?
না। এখন আক্রমণ-করলে বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।
আর একজন চিৎকার করে উঠল
এই দেখুন সর্দার ওরা একটা লোককে জলে ফেলে দিচ্ছে।
একে হাত-পা বাঁধা তার উপর গলায় একটা ভারি জিনিস। নেড ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগল।
নেড জলে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সর্দারও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।
সর্দার ডুব সাঁতারে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল নেডের দিকে
কাছে পৌঁছেই সর্দার ভারি জিনিসটা বাঁধা দড়িটা কেটে দিল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

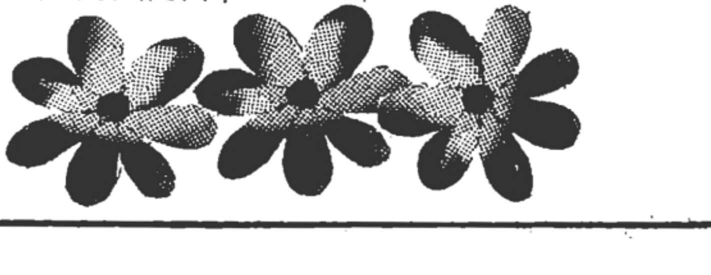
আকাশে মেঘ জমলে রেলের, বিশেষ করে পূর্ব রেলের কর্তাদের হৃদয়ে ময়ূরের নাচ-টাচ শুরু হয়ে যায়। হবেই তো! ওদের তো আর গাঁটের পয়সা খসিয়ে টিকিট কিনে ঘন্টার পর ঘন্টা স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন নামক দুর্লভ বস্তুর জন্য হা পিত্যেশ করে থাকতে হয় না। ভালো ভালো ট্রেনে ওদের জন্য ভি আই পি কোটা বাঁধা। তাতে চড়ে ওরা দেশের করদাতা এবং পয়সা-গোনা সাধারণ যাত্রীদের ধন্য করেন। ওরা অবশ্য ট্রেনে চড়েন বিনা পয়সায়; সেটা দেশের লোককে সেবা করার জন্যই। তাই বর্ষায় ওদের হৃদয়ে উল্লাস জাগলে দোষ দেওয়া যায় না। সে জন্যই তো ওরা সুন্দর করে ছবি-টবি এঁকে নিচে পূর্ব রেলের নাম জুড়ে দিয়ে কাগজে কাগজে কয়েক হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দেন।

আবার দেখুন না, খেলাধুলার প্রতিও রেলের কর্তাদের কত দরদ! এই যেদিন মসকোতে অলিমপিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল সেদিনও কাগজে কাগজে পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, এমন কী মেট্রো রেলও কত সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন দিলেন! যেন পূর্ব রেলের গার্ডবাবু ঠিক মতো ফ্ল্যাগ না দেখালে মসকোর 'মিশা' চলতেই পারছিল না! এসবের জন্য কয়েক হাজার টাকা তো যাবেই! প্রচার খাতে বরাদ্দ করা টাকার একটা সদগতি তো করা চাই!

যেদিন এসব বিজ্ঞাপন বেরোল সেদিনই সন্ধ্যায় শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীরা যাচ্ছেতাই অশোভন আচরণ করে বসলেন। ট্রেন নেই এবং ট্রেন ছাড়ছে না বলে ওরা নাকি উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর শুরু করেন। ওরা গত দশ-বারো বছর ধরেই এরকম কাণ্ড করে আসছেন। শনিবার ১৯ জুলাই কলকাতার রাস্তায় প্রায় সাঁতরে ওরা সব সন্ধ্যের পর শিয়ালদায় এসে জমে ছিলেন। বাস-ট্রামের কোন বালাই ছিল না। ট্রেন না থাকলেই বা ওরা উত্তেজিত হন কেন? পুলিশ অবশ্য লাঠি মেরে আর গ্যাস ছুঁড়ে ওদের শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। সারা বিকেল ভিজবার পর নারী-শিশুসমেত হাজার হাজার যাত্রী রাত সাড়ে বারোটার পর থেকে শিয়ালদহে ট্রেন চাপতে পেরে ধন্য হয়েছেন – এটাও কী কম কথা!

যাত্রীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদহে নতুন স্টেশন ভবন করা হয়েছে, অনেক বুকিং কাউনটার তৈরি করে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পয়সা দিলেও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ টিকিট ছাপা হচ্ছে না, শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন অনেক ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে, ছটার গাড়ি কটায় ছাড়বে কিংবা দু' নমবরের গাড়ি ক' নম্বরে ছাড়বে—এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত ঘোষণা করা হচ্ছে তবু যাত্রীরা মাঝে মাঝেই অভদ্র আচরণ করেন—এ ভারি অন্যায়। বাজেটে সবে নিত্যযাত্রীদের টিকিটের দাম ১৫% ভাগ বেড়েছে পরজ্ঞাপে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আর এক দফা ভাড়া বাড়ল বলে! এসব নিয়ে যাত্রীদের মাথা গরম করা উচিত নয়। তাহলে রেলের বাবুরা কাব্যি করা বিজ্ঞাপন দেবেন কি করে?

আর একটা ন্যায্য কথা: ট্রাম-বাস না থাকলেও যদি কলকাতার লাখ লাখ মানুষের দিন চলে যায়, তাহলে শিয়ালদহে ট্রেন না থাকলে দশ/বারো লাখ মানুষেরই বা দিন কাটবে না কেন?



পরিবর্তন

১ আগসট ১৯৮০
তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
দাম ১.৫০ টাকা

বিমান মাশুল: পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা.
ভারতের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র: চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক: ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক: নিতাই ঘোষ

লোকসংস্কৃতি চর্চায় লাভ কাদের ?

১ মে ১৯৮০ পরিবর্তনে পশুপতি মাহাতোর প্রতিবেদনের 'লোকসংস্কৃতি চর্চায় ল্যাভ হয় কাদের' আলোচনা তাঁর কথা দিয়েই শুরু করছি। 'যাদের সংস্কৃতি নিয়ে লোক-সংস্কৃতির পণ্ডিত ও গবেষকরা ব্যস্ত, সেই সাধারণ মানুষদের কাছে এদের চর্চিত অর্ধবিদ্যার ফসল পৌছাতে পারেনি। তা ঘটলে যারা মৌন সংস্কৃতির ধারক বাহক তারাও সরব হতেন।' যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শোষণ যাদের উপর অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে, স্বাধীনতার বত্রিশ বছরে তার বিশেষ কিছু কেন, কিছুই কমেনি বরং বেড়েছে।

লোকসংস্কৃতিকে কোন এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জংলী ফুলের সঙ্গেই বোধ হয় তুলনা করা চলে। সেই অলৌকিক সৌন্দর্য, সুগন্ধ, মাধুর্য অবলোকন এবং পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য যে শ্রম এবং হৃদয়ের প্রয়োজন তা ক'জনের আছে? আধুনিক শহুরে শিক্ষা এবং সারল্য দুটোই পরস্পরবিরোধী। লোক সংস্কৃতির সমস্তটাই সারল্যের কোমলতায় গড়া। শহুরে শিক্ষিত এবং নিম্ন-মনস্কদের কাছে সেই সংস্কৃতি লজ্জাবতী লতার মতোই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই দিয়ে, অনেকেই সেই জংলী ফুলের পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, নিজেদের মনের মত করে নিজ গোষ্ঠীর লোকজনকে উপহার দিয়ে তাৎক্ষণিক বাহবা পেতে ব্যস্ত। স্বজন তোষণ নীতি সর্বক্ষেত্রের মত এখানেও অবাধে বিচরণশীল।

আকাশবাণীর জেলাবেতার বিভাগের প্রাক্তন কর্ণধার ডঃ মলয় পাহাড়ীর পরিচালনায় পুরুলিয়ার গান ইত্যাদির যে রূপ ফুটে উঠেছিল তা এই রকম আলোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভুল উচ্চারণ নিয়ে নাটকের সংলাপ, উদ্ভট বিষয়বস্তু 'ভাদরিয়া ঝুমুরকে' 'ভাদুগান' আখ্যা দেওয়া ইত্যাদি যাচ্ছেতাই ভুল ত্রুটিতে জেলাবেতারের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই দুষ্ট। পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যের দলগুলি সাধারণত দলের প্রধান শিল্পীদের নামেই পরিচিত। যেমন 'ধুঁধা মাহাতর দল', 'গোপাল মণ্ডলের দল' 'অনিল মাহাতর দল' ইত্যাদি।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পুরুলিয়ার নৃত্যশিল্পী 'গম্ভীর সিং এর দল' নিয়ে বিদেশ পরিক্রমা করেছিলেন। বিদেশে তিনি নিজেকে সেইদলের প্রশিক্ষক বলে জাহির করে ছিলেন কিনা এবং ছো-নৃত্য সম্বন্ধে কোথায় কী মন্তব্য করেছিলেন সে সমস্ত কথা বাদ দিলেও জেলাবেতারে ডঃ মলয় পাহাড়ীর পরিচালনায় ঘোষিত হয়েছিল—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ছো-নৃত্যের দল নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন—ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন—ডঃ ভট্টাচার্যের কোন দল থাকলে তিনি কোন ভূমিকায় নাচেন ?

জেলাবেতারের বর্তমান কর্মকর্তা সুনীল সান্যাল মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম— পুরুলিয়ার জেলাবেতারে যেসব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন তাদের বেশির ভাগের উচ্চারণ ভঙ্গী পুরুলিয়ার উচ্চারণ ভঙ্গীর সঙ্গে মেলে না কেন ? পুরুলিয়ার কথা বলতে তারা ভুল করেন কেন ? তিনি বলেছিলেন—'সবাই তো পুরুলিয়ার চলতি ভাষা জানেন না।' যারা পুরুলিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাদেরকে দিয়ে পুরুলিয়ার গান ঝুমুর, পুরুলিয়ার ভাষায় নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করানো হয় কেন ?' তিনি বলেছিলেন—'পুরুলিয়ার গ্রামে গঞ্জে যেতে কি পরিমাণ কষ্টস্বীকার করতে হয় তা তো জানেনই, বাসের ভেতরে উপরে এতলোকের গাদাগাদি, ঠিক যেন নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' —এর থেকে এটাই পরিষ্কার যে সার্কিট হাউস বা ইরিগেসন বাংলোর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে পুরুলিয়া শহরে বসেই ওঁরা সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতে ভালবাসেন। কিন্তু এটাই কি করণীয় ? পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির যথার্থ ধারক বাহকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকেন এই কারণে।

কেউ সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যান। পুরুলিয়ার অভুক্ত শিল্পীদের কাছে নিখরচায় লনডন প্যারিস ঘুরে আসা হাতে চাঁদ পাওয়ার থেকেও বেশি কিছু। তাই লনডন, প্যারিস আমেরিকা অসট্রেলিয়ায় নাচ দেখিয়ে কতটাকা রোজগার হোল তার হিসেব দাবি করতে তারা পারেন না। বেতারে কারও গান প্রচারিত হলেই তারা ধন্য হয়ে যান, তার জন্য টাকা দেওয়া হয় কিনা এটা তারা ভাবেন না। না পেলেও উচ্চবাচ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোকসংস্কৃতি-বিদরা রাতারাতি বড়লোক হতে সব-সময়ই সচেষ্ট।

লেখক পশুপতি মাহাতো পুরুলিয়ার গ্রামের ছেলে। পুরুলিয়ার মানুষের উপর অবিচার অত্যাচারে যাদের অন্তর ব্যথিত হয় উনি তাদের অন্যতম। ১৪ থেকে ১৬ মারচ পুরুলিয়ার মানভূম' ভিকটোরিয়া ইনসটিটিউশনে যে বর্ধমান বিভাগীয় লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়ে গেল সেখানে তিনি আমন্ত্রিত হননি। পুরুলিয়ার যথার্থ শিল্পীরা যে কিভাবে উপেক্ষিত এবং অপমানিত হতে পারেন এবং যারা পুরুলিয়ার সংস্কৃতির কিছুমাত্র বোঝেন না তারা লোকসংস্কৃতিকে যে কতটা বিকৃত করতে পারেন এবং লোক-সংস্কৃতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় যে কতটা দুঃসাহস দেখাতে পারেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই বর্ধমান বিভাগীয় লোকসংস্কৃতি উৎসব। রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় গেল, কি জন্যে ব্যয় হোল তা দেবা ন জানন্তি কুতো সাধারণ মনুষ্যাঃ। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের স্থায়ী রাজ্য সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তে তাই লেখকের প্রশ্ন 'লোক সংস্কৃতি চর্চায় এবারও লাভ হবে কাদের ?' যথার্থ।

সুনীলকুমার মাহাত, কালুহার
পুরুলিয়া

'পাইরাব'

পশুপতি মাহাতো মহাশয়ের 'লোক-সংস্কৃতি চর্চায় লাভ হয় কাদের ?' প্রতিবেদনটি পড়লাম। যুক্তিসিদ্ধ তথ্যপূর্ণ মননশীল প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রতিবেদনটির ৪র্থ কলমে ৪৫ পৃষ্ঠায় ১২শ লাইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণ প্রমাদ আছে। গানটির দ্বিতীয় লাইনে মুদ্রিত 'পাইবার' শব্দটির স্থলে 'পাইরাব' শব্দ হবে। অর্থ পার হব।

বর্তমানে লোকসংস্কৃতি চর্চায় যে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা লেখকের লোক-দরদী মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেদনে পরিবেশিত তথ্য সমূহ বর্ণে বর্ণে সত্য। তথাকথিত লোকসংস্কৃতি বিশারদগণ যদি লোক-সংস্কৃতির মনগড়া রূপ প্রদানে সচেষ্ট থাকেন তবে লোকসংস্কৃতি আর সুস্থ-ভাবে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ।

গুণধর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম

বিচারক

১ মে পরিবর্তনে সুদীপ মজুমদারের লিখিত 'আমাদের বিচারকরা কতটা নিরপেক্ষ' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম। আমাদের দেশের বিচারকেরা যে রাজ-নৈতিক টানাপোড়েনের ঊর্ধ্বে নন তা অনেকের দৃষ্টান্ত দিয়ে সুদীপবাবু প্রমাণ করেছেন।

আমাদের দেশে বিচারালয়ে প্রকৃত ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কোথাও হয় বলে শুনিনি। শুনেছি দু'পক্ষের উকিলের জেরার বিচার হয়। যে যত জবরদস্ত উকিল তার তত পসার। প্রতি এলাকায় এরকম জনশ্রুতি আছে যে 'অমুক উকিল দাঁড়ালে হারা কেসকেও জিতিয়ে দেয়।' অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা যাই হোক 'অমুক উকিলরা' যে পক্ষে, জয় সে পক্ষে।

আমাদের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এমন ঘটনা আকছার দেখা যায় যেখানে প্রকৃত ঘটনার Report দিয়ে পুলিশ আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিলে তবেই সেই আসামীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব, সেখানে পুলিশ বিভাগের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই এই চার্জশীট দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে। আর এই ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ভর করে কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব অথবা কাঞ্চন-কৌলীন্যের উপর।

আর একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানবো। কয়েক বছর আগে এক মহকুমা আদালতে একটি বিচার চলাকালীন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ কয়েকজন আসামীকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় হাজির করলো। কাঠগড়ায় উঠে ওরই মধ্যে থেকে একজন আসামী বিচারকের উদ্দেশ্যে জানালো—'হুজুর আমার একটা আর্জি আছে। আমার কিছু অভিযোগ আছে পুলিশের বিরুদ্ধে। আমি তা লিখিত ভাবেই জানাচ্ছি।' এই বলে সে একটা কাগজ হাত বাড়িয়ে একজন আদালতের কর্মচারীর হাতে দিয়ে বিচারকের কাছে পেশ করলো। বিচারক বেশ গম্ভীর হয়ে সবটা পড়ে প্রশ্ন করলেন—'কি করা হয় ?' 'হুজুর আমি একজন মুচি।' বিচারক নিদারুণ ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, 'মুচির কাজ না করে একটু লেখালেখি প্র্যাকটিস করলেই তো পারতে। বাংলা ভাষায় যদি এত পাণ্ডিত্য তবে এসব দলের সঙ্গে মেশো কেন ?' ইত্যাদি।

আদালতকক্ষে উপস্থিত সবাই হাসছিল। হাসতে পারিনি আমি। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে বিচারক দারুণ রাগের সঙ্গে আবেদনপত্রটি ফেলেছিলেন পাশে। আর বেচারা ঐ আসামী শুধু মাথা হেঁট করে অতগুলো লোকের উপহাসের হাসি নিঃশব্দে সহ্য করতে লাগলো। আমার মনে হয়েছিল ঐ মুহূর্তে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠি। মনে হয়েছিল ঐ বিচারককে প্রশ্ন করি—

ভাষা যাই হোক তার অভিযোগ সত্য কিনা তা যাচাই করে দেখার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না। কোমরে দড়ি পড়লেই কি সবাই অপরাধী? পুলিশ কি অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে কখনো ধরে না? পুলিশ কি অকথ্য অত্যাচার করে না? কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারিনি। মনে পড়ে গিয়েছিল সেই সার্বজনিক ভীতির কথা—'ক্যাবারেতে অবধারিত নিষেধ।'

মাফুলা খাতুন, বাঁধপুর, হুগলী

শিব ঠাকুরের আপন দেশ—তারকেশ্বর

পরিবর্তনের ১৬ মার্চ '৮০ সংখ্যায় তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। ঐ রচনাটির পরিপ্রেক্ষিতে তারকেশ্বর এসটেটের ম্যানেজার শ্রী কে কে মজুমদার যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন ১৬ মে '৮০ সংখ্যায় 'সমীপেষু' বিভাগে আমরা তা প্রকাশ করেছিলাম; সেই সঙ্গে লেখকের উত্তরও। শ্রীমজুমদার তাঁর পত্রে রচনাটিকে ভ্রান্ত তথ্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েই থেমে থাকেননি, লেখক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে এসটেট বা মঠ সম্পর্কে 'ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন হইতে নিবৃত্ত' [illegible]

সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে একগুচ্ছ চিঠি। পত্রলেখকেরা সকলেই তারকেশ্বর অঞ্চলের মানুষ। সকলেই তারকেশ্বর মন্দির ও মঠের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত আছেন বা ছিলেন। এ'দের কেউ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কেউ ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মী, কেউ বা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র।

তারকেশ্বরের কর্তাব্যক্তিদের নানা দুর্নীতি ও অসদাচরণের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখেছেন 'তারকেশ্বর এস্টেট কর্মচারী সমিতি'র সম্পাদক নির্মলকুমার পাইন, লিখেছেন—শ্রীমৎ ১০৮ পরমহংস স্বামী অমলানন্দ তীর্থসরস্বতী (ধর্মপ্রাণ), কর্মচারী সমিতির পক্ষে অসিত ভট্টাচার্য, মৌখিকভাবে ছাঁটাই হওয়া কর্মী কৃষ্ণপদ কুণ্ডু এবং তারক সিং (শ্যাম বাহাদুর), অপর এক কর্মী ধ্রুবচরণ দাস। এছাড়া ওঁরা পাঠিয়েছেন—'জনগণের প্রতি আবেদন' এবং একটি 'বিজ্ঞপ্তি'।

বছর তিনেক আগে কিভাবে চাকরি খুইয়েছেন কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, তার সজল বিবরণ রয়েছে তাঁর চিঠিতে। তিনি ছিলেন দীর্ঘ দশ বছরের কর্মী। নিয়মিত কাজের সঙ্গে তাঁকে মোহান্ত মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারির ব্যক্তিগত কাজও (গরুর খড় কাটা ইত্যাদি) করতে হতো। এরকম কাজ করতে তিনি রাজি না হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মৌখিকভাবে ছাঁটাই করা হয়। চিঠির শেষে শ্রীকুণ্ডু লিখেছেন, 'এমতাবস্থায় আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ লইয়া অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করিতেছি।'

যন্ত্রগণক

১ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'সম্পাদকীয়' কলমে যন্ত্রগণকের ভ্রম সম্বন্ধে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান। বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন কি?

তপনকুমার ঘোষাল, দেবীপুর, বর্ধমান

[যন্ত্রগণকের ভুল সংক্রান্ত খবর ওয়াশিংটন থেকে রয়টার পরিবেশন করেছিল। গত ৮ জুন দৈনিক কালান্তরে প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটি বের হয়। হেডিং ছিল—"একটু হলেই মার্কিনী ভুলের মাশুল দিত দুনিয়া।"—সম্পাদক]

একই অভিযোগ তারক সিংয়ের, একই কারণে তাঁকেও ঐভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে।

[illegible] ধ্রুবচরণ [illegible] তারকেশ্বর এস্টেটের একজন [illegible] কর্মী। [illegible] করতে [illegible] করেছিলেন তিনি। চাকরির [illegible] 'অভিযোগে'। কোর্ট কাছারিও হয়। [illegible] বছর মামলা চলার পর ধ্রুবচরণ ডিক্রি পান। চন্দননগর আদালত আদেশ দেন তাঁকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বহাল করার জন্য। এসটেট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, আজও মামলা চলছে।

ধ্রুবচরণ লিখছেন, "আমি ৩৫.৫০ টাকার একজন সামান্য কর্মচারী ছিলাম। আমার পক্ষে এস্টেটের সঙ্গে Case চালানো কষ্টকর ব্যাপার। ...আমার অনেক দেনা হইয়া গিয়াছে। আমার স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার চালাইতে পারিতেছি না।"

দেশ জুড়ে বাবা তারকনাথের অগণন ভক্ত। প্রতিদিনই মানি অরডার আসে তারকেশ্বরে। ভক্তরা টাকা পাঠান বাবা তারকনাথের সেবার জন্য। নিয়মানুসারে এ টাকা 'গদিতে' জমা পড়ার কথা।

কিন্তু নির্মলকুমার পাইন, সম্পাদক, 'তারকেশ্বর এস্টেট কর্মচারী সমিতি', এক গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, যে টাকা 'ম্যানেজার, তারকেশ্বর এস্টেট' ঠিকানায় আসে সে টাকাই শুধু গদিতে জমা পড়ে; কিন্তু 'মোহান্ত মহারাজ, তারকেশ্বর এস্টেট' ঠিকানায় এলে গদিতে জমা পড়ে না। চিঠিতে নির্মলবাবু জনসাধারণের প্রতি আবেদন রেখেছেন যে বাবা তারকনাথের প্রণামী হিসেবে টাকা পাঠালে তা এসটেট ম্যানেজারের ঠিকানায় পাঠাবেন।

অসিত ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর মঠ পরিচালিত জগন্নাথাশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তারকেশ্বর এসটেটের এই কর্মীটি কাজের অবসরে নিয়মিত পড়াশুনোও চালিয়ে আসছিলেন। তাঁর অভিযোগ, যেহেতু তিনি কর্মীদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁকে কয়েক মাস আগে মারধোর করে ছাত্রাবাস থেকে উৎখাত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার অ্যাডমিট কারড আসা সত্ত্বেও সেই অ্যাডমিট কারড যথা সময়ে দেওয়া হয়নি বলে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁর প্রশ্ন: পড়াশুনো করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারলাম না, এজন্য দায়ী কে?

শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইন-কানুন এমনই সর্বনেশে যে সপ্তাহের অর্ধাংশই মৌনব্রত পালন করেন এমন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও [illegible] হয়েছেন। চিঠি লিখে তিনিও তাঁর দাবি [illegible]—[illegible] হোক। ঐ স্বামী, [illegible] অমলানন্দ ১০৮ তীর্থ [illegible] লিখছেন যে মোহান্ত মহারাজ এবং তাঁর আত্মীয়ের প্ররোচনায় কিছু [illegible] প্রকৃতির [illegible] তাঁর ঘরে এসে হামলা করে। মোহান্ত মহারাজকে সব জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। অথচ বারো বছর আগে মোহান্তই তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছিলেন তারকেশ্বর মঠে।

পরিবর্তনে প্রকাশিত নিবন্ধটিতে প্রতিবেদক লিখেছিলেন, "তারকেশ্বর কি মোহান্ত চালান? নাকি তার পার্শ্বচরবর্গ। এ প্রশ্ন তারকেশ্বর বাসিন্দাদের অনেকেরই। মোহান্ত নন, মঠের মধ্যে এগারোটি ঘর নিয়ে রাজার হালে যিনি থাকেন তিনিই যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী একথা তারকেশ্বরের শিশুও জানে। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন—সাধারণ ঐ কর্মচারীটি এতো ক্ষমতা পেলেন কিভাবে?"

এর প্রতিবাদ করে এসটেটের ম্যানেজার কে কে মজুমদার লিখেছিলেন, "মঠে কোনও কর্মচারী এগারখানা ঘরে বাস করে [illegible] তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ইহা সত্য নয়।"

[illegible] মানুষটির অঙ্গুলি-হেলনে তারকেশ্বরে মিনিটে মিনিটে [illegible] গাভীর খড় [illegible] তারকেশ্বর [illegible] মন্দির [illegible] নির্বিবাদ [illegible]—ইহা সত্য নয় মাত্র তিনটি [illegible] সেই [illegible] বেমালুম অস্বীকার করতে পারেন, আমরা [illegible] জানি, তারকেশ্বর [illegible] এই 'মহাপুরুষটির' [illegible] কর্মের তদন্ত ও বিচার [illegible] একটি স্মারকপত্র এসটেট [illegible] সভায় পেশ করেছিলেন। [illegible] কমিটির সদস্য হিসাবে শ্রীমজুমদার ঐ অভিযোগপত্রটি দেখে থাকতে [illegible]। আশা, শ্রীমজুমদার একথা [illegible] 'ইহা সত্য নয়...ইহা সত্য নয়।'

তারকেশ্বরে হাজার দুর্নীতি। যে মন্দির ও মঠকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয়, তার কোনো হিসাবপত্র জানতে পারেন না জনসাধারণ—অভিযোগ কর্মচারী সমিতির। শুধু তাই নয় দেবোত্তর জমি খামখেয়ালী ভাবে বিলিবণ্টন করার অভিযোগও এনেছেন তাঁরা। দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আগেকার এক মোহান্ত সতীশ গিরির মূল্যবান রূপার পালঙ্ক আজ তারকেশ্বরের এক কর্মচারী নিজের সম্পত্তি হিসেবে দিব্যি ভোগ করছেন।

প্রতিবেদকের সংযোজন

'এসব লিখে কতোদূর কি করতে পারেন আপনারা?'—তারকেশ্বর শহরের বাসিন্দা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। তথ্য সংগ্রহ করতে প্রথম যখন তারকেশ্বর গিয়েছিলাম তখন আলাপ হয়েছিলো সৌম্য, পণ্ডিত মানুষটির সঙ্গে। তারকেশ্বরের ইতিহাস শোনাতে শোনাতে বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করেছিলেন...

আজ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্নগুলিই নিজেকে নিজে করছি। এসব লিখে কি লক্ষ লক্ষ টাকা যে মন্দিরের আয়, সে মন্দিরের দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে? কর্মচারীরা পাবেন চাকরির নিরাপত্তা? তীর্থ করার নাম করে তরুণ 'তীর্থযাত্রীদের' একাংশের বেলেল্লাপনা বন্ধ হবে? সমস্ত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করবেন তারকেশ্বরের পাণ্ডারা?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন

সমীপেষু

যারা, এই সামান্য রচনাটি তাদের চোখে পড়বে কিনা—জানি না।

জ্যোতিষী

১ জুলাই সংখ্যায় 'জ্যোতিষী পণ্ডিত, না ৪২০ ?' এর সমালোচনা দেখলাম। প্রথমে মিহির মজুমদার প্রশ্ন করেছেন—আমি নিজে জ্যোতিষী হয়েও মানুষকে জ্যোতিষীর কাছে যেতে নিষেধ করেছি কেন ?

যখন পত্রিকায় লিখি তখন লেখক হিসাবেই লিখি, জ্যোতিষী হিসাবে নয়। চেম্বারে আমি নিশ্চয়ই জ্যোতিষী।

উনি বলেছেন—'শুক্র ড্যামেজ থাকলে প্রবাল পরতে হবে কেন তাও বোধগম্য হল না।'

শুক্র ড্যামেজ থাকলে সব সময়ই হীরক ধারণ করতে হবে—এমন কথা হিন্দু-জ্যোতিষের কোথাও উল্লেখ আছে কি ? বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শুক্র বা অন্য যে কোন গ্রহ অশুভাবস্থায় থাকুক না কেন—মহর্ষি পরাশর মতে সর্ব প্রথম ও প্রধান প্রতিকারক রক্তপ্রবাল।

শুক্র অশুভ হলে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হয়। সেক্ষেত্রে হীরক ধারণের পরিবর্তে শ্বেত প্রবাল ধারণেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস আরোগ্য হয়। এখানে যদি কোন জ্যোতির্বিদ অশুভ শুক্রের জন্য শ্বেত প্রবাল প্রতিকার করেন—তাতে আপনার আপত্তি করার কি আছে ?

মিহিরবাবু বলেছেন—আমি নাকি লিখেছি, 'কর্মফল খারাপ থাকলে রত্নে কিছু হয় না।' আবার বলেছি, 'রত্ন ধারণে দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি নিরাময় হয়।' তাহলে ব্যাধির জন্য যে ভোগান্তি সেটা কর্মফল নয় ?'

আপনার বক্তব্যের সাথে আমার লেখার আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। আমার লেখার অংশ তুলে ধরছি। এবার লেখানুসারে আপনার প্রশ্ন যথাযথ হয়েছে কিনা ভেবে দেখুন।

"যদি রত্ন নির্বাচন যথাযথ হয়, রত্ন যদি সাচ্চা এবং উৎকৃষ্টমানের হয় তবে বিযুক্ত গ্রহের কুফল অনেকাংশে লাঘব হয়।

তবে জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল যদি অতিমাত্রায় খারাপ থাকে তাহলে গ্রহরত্ন ধারণেও সুফল পাওয়া যায় না, গ্রহরত্ন ধারণে প্রধানত অদৃঢ় কর্মফলের হ্রাস হয়। উৎকট পাপের ভোগ বা দৃঢ় কর্মফল রোধ করা যায় না।"

এবার আসছি যুগলকান্তি রায়ের প্রশ্নের উত্তরে। যুগলবাবু আমার লেখার ওপর প্রশ্ন রেখেছেন, 'গ্রহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষের অবস্থার পরিবর্তনই হয় তাহলে লেখক কিভাবে বলেন, 'যদি রত্ন নির্বাচন যথাযথ হয়··· কুফল অনেকাংশে লাঘব হয় ?' এই পরস্পরবিরোধী কথাগুলির ক্ষেত্রেও কি সেই মেনে নেওয়ার প্রশ্ন ?'

আমার লেখায় পরস্পরবিরোধী প্রশ্ন এলো কোথা থেকে তা বুঝতে পারছি না। গ্রহগণের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমনের ফলে রাশি, লগ্ন, নক্ষত্র ও জন্মকালীন সর্বাঙ্গীন গ্রহাবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে শুভাশুভ অবস্থাভেদে ব্যক্তিগত ভাবে এক একজনে এক এক রকম ফল (শুভ বা অশুভ) পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্তমান গ্রহের অশুভাবস্থা অথবা জন্মকালীন গ্রহের অশুভ অবস্থান—সে যে কোন কারণেই দুর্ভোগ হোক—তার হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা পেতে রত্ন ধারণের কথা ঋষিরা বলেছেন। এতে পরস্পরবিরোধী কথা হল কেমন করে?

প্রশ্ন করেছেন, অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান কি ? ঋষিদের সমাধিলব্ধ জ্ঞানকেই বা চূড়ান্ত সত্য বা অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে কেন—তার কোন ব্যাখ্যা লেখক করেননি।

যে ইন্দ্রিয়াতীত বিশেষ জ্ঞান ঋষিদের সমাধিকালীন মহাশূন্যে প্রতিভাত হয়েছে—যার কোন ভ্রান্তি নেই—যা চিরন্তন শাশ্বত সনাতন সত্য—যা সীমিত জ্ঞান মানুষের গবেষণা ও যুক্তিতর্কের বহির্ভূত—তাই অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান।

জন্মদাতা পিতা যেমন সত্য তেমনই সত্য ঋষিদের সমাধিলব্ধ জ্ঞান। সেই সূত্রে জন্মের পর প্রকৃত পিতার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? নাকি করেছে কেউ কখনও ? অতএব সমাধিলব্ধ জ্ঞানকে চূড়ান্ত সত্য বা অভ্রান্ত বলে যদি না মেনে নেন তবে তো পাতঞ্জল যোগ-দর্শন থেকে শুরু করে হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রকে পুড়িয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবক্তা মহর্ষি পরাশর, ভৃগু প্রমুখ ঋষিদের তেমাথা পথে বসিয়ে রেখে আসতে হয়।

ঋষিদের সমাধিলব্ধ জ্ঞান সর্বকালে সকলের ক্ষেত্রে সমান ও নির্ভুল ভাবে প্রযোজ্য। আজকের প্রয়োগকর্তারা যদি তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে ভুল করেন তবে কতজনের ফল মিললো, কতজনের মিললো না তা দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? অপপ্রয়োগে সত্যকে মিথ্যা বলে মনে হলেও সত্য কিন্তু সর্বদাই সত্য।

শিবশংকর ভারতী

এ সম্পর্কে আর কোন চিঠি প্রকাশিত হবে না—সম্পাদক

জয়পুর :
লেখকের বক্তব্য

শ্রীঅরবিন্দ সামন্তকে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জয়পুর সম্পর্কিত আমার লেখা প্রবন্ধটি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার জন্যে।

'বাঙালী ব্রাহ্মণ জয়পুর শহরের নকসা তৈরি করেছিলেন' (পরিবর্তন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০) লেখাটি নিছক ভ্রমণ সাহিত্য বা সরস রম্যরচনা নয়, অপিচ ইতিহাস নির্ভর নিবন্ধ। তথ্যের ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে বিদগ্ধ মনীষীদের প্রামাণ্য রচনার সাহায্য নিতে হয়েছে এবং বিনীত ভাবে সে কথা আমি প্রবন্ধের শেষে স্বীকারও করেছি। তা সত্ত্বেও শ্রীসামন্ত জয়পুর নগরীর রূপকার বিদ্যাধরের বয়সের ব্যাপারে আমি 'তথ্য কোথা থেকে পেয়েছি জানি না' বলে কেন কটাক্ষ করলেন বুঝতে পারলাম না। প্রবন্ধে আমি জানিয়েছি বিদ্যাধর ৫৮ বছর জীবিত ছিলেন এবং বিদ্যাধরের জন্ম সাল ১৬৯৪ খৃস্টাব্দ—শ্রীসামন্তের প্রতিবাদের পরেও আমার মত পালটানোর কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। ইতিহাসে স্থান কাল পাত্রের ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিভিন্ন ইতিহাসকারেরা একমত পোষণ করেন না। সে ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রসঙ্গে সর্বজনগ্রাহ্য এবং প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদের মতটিকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। জয়পুরের বরেণ্য ঐতিহাসিক ও বর্ষীয়ান পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীঝাবরমল শর্মা 'শিলামাতা কা প্রসাদ' নিবন্ধে বিদ্যাধর প্রসঙ্গে লিখেছেন—'দীবান বিদ্যাধর চক্রবর্তীকা জন্ম সম্বত ১৭৫০ বিঃ মে হুয়া থা ঔর মৃত্যু মহারাজা সওয়াই মাধো সিং (প্রথম) কে রাজ্য কাল মে সম্বত ১৮০৮ মে হুই।' বিক্রম শতাব্দীকে খৃষ্টিয় শতাব্দীতে পরিবর্তিত করলে বিদ্যাধরের বয়স এবং জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে আমার যে ভুল হয়নি সেটা প্রমাণিত হবে। রাজস্থানের ইতিহাস ও গবেষণা সাহিত্যে পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার অবদান সম্পর্কে শ্রীসামন্তের কিছুমাত্র ধারণা থাকলে তিনি জানতে পারতেন কেন অন্য মনীষীদের ভিন্ন মত থাকলেও পণ্ডিত শর্মার বক্তব্যটিকেই গ্রহণীয় মনে হয়েছে বর্তমান লেখকের। শ্রীশর্মার প্রবন্ধটি আমারই সম্পাদনায় প্রকাশিত জয়পুর দুর্গাবাড়ি এ্যাসোসিয়েশনের ১৯৭৫ সালের পূজা বার্ষিকীতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে।

জয়পুরের জন্ম তারিখের ব্যাপারে আমি ডঃ অশোককুমার দাসের যে লেখাটিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছিলাম তাতে এই ধরনের উল্লেখ আছে—From a patta granted to Pandit Jagannath Samrat eight bighas of land donated to him for Vastusanti, Vinayaksanti and Nabagrahasanti connected with the foundation sites of the Chandramahal, we came to know that the foundation ceremony was held on 1st Pans 1784 V.S. = 11th November 1727 A.D. (Jaipur the city of Sawai Jai Singh : Puja Annual : 1975 A.D.B.A.) ডঃ দাসের এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় দু'বছর বাদে সরকারী তদারকীতে জয়পুরের ২৫০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে কেন যে ৭ দিন পেছিয়ে জন্মদিন মানা হল সেটা বলা মুস্কিল। ডঃ দাস অবশ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধে ১৮ নভেম্বর তারিখটি গ্রহণ করেছেন—এক্ষেত্রে প্রথম প্রবন্ধের তারিখটি গণনায় ভুল হয়েছে ডঃ দাসের এমন ভাবা সঙ্গত কিনা জানি না।

সুদর্শনগড় দুর্গের জনপ্রিয় নাম 'নাহাড়গড়' এবং পাহাড়টি সিংহের আকারের মত দেখতে বলেই যে এমন একটি নামের উৎপত্তি এ ধারণা স্থানীয় প্রাচীন লোকেদের মধ্যে বহুল প্রচলিত—আমি সেই কিংবদন্তীটিকেই গ্রহণ করেছিলাম। তবে নাহারগড়ের নাম ইংরাজি প্রবন্ধে টাইগার কোর্ট বলে উল্লেখিত আছে সেটি আমার জানা ছিল। 'নাহার' শব্দের হিন্দী ভাষ্য 'শের' অর্থে বাঘ-সিংহ দুটিকেই বোঝায় বলে আর্ষ প্রয়োগের মত এই বিভ্রান্তি চলে আসছে কিনা বলা শক্ত। শ্রী কে. ডি. ভার্মার রাজস্থানের গাইড বইটিতে আমার কিংবদন্তীর সমর্থন আছে।

শ্রীসামন্ত সবশেষে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ১৭২৭ সালের নভেম্বরে যে শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৭৩০ সালের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র দু-আড়াই বছরের মাথায় সে শহর রাজার বসবাসের যোগ্য এবং রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে কি করে ?

আমাদের হুগলী নদীর দ্বিতীয় সেতু অথবা হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ লাইন কিংবা পাতাল রেলের কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে ভাবলে শ্রীসামন্তের

সন্দেহকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু জয়পুরের জন্ম লগ্নের ইতিহাসে মানুষের কাজকর্ম করার ইচ্ছেগুলো একটু অন্য ধরনের ছিল, যার সমর্থন ডঃ দাসের একটি লেখায় রয়েছে : within a brief period of 2 years (from 1727 A.D.) Vidyadhar was able to build most of the city which included palace complex, the Havelis—Sawai Jai Singh came down from Amber and settled in Jaipur as soon as it was ready. (And so was Jaipur Born : Taj Magazine, Vol. 6 No. 3, 1977)

কিন্তু শ্রীসামন্ত হয়তো এই উদ্ধৃতিটুকুতে খুশি নাও হতে পারেন কারণ এখানেও জয়সিংহের জয়পুরে চলে আসার সালটি স্পষ্ট ভাষায় লেখা নেই, সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর মতে ব্যাপারটা এখনো দুর্বোধ্য লাগতে পারে তাই ডঃ দাসের অন্য আর একটি প্রবন্ধের স্মরণাপন্ন হব : The whole city with its paved roads, underground drainage, high protection wall with battlements and turrets, enormous gateways, shops, havelis and houses was almost completed by 1730 A.D. when the Maharaja shifted his capital from Amber. (Jaipur the city of Sawai Jai Sigh : Puja Annual. 1975 J.D.B.A.)

বারবার ডঃ অশোককুমার দাসের প্রবন্ধ থেকেই উল্লেখ করলাম এই কারণে যে শ্রীসামন্ত ডঃ দাসকে আমার 'গুরু' এবং সম্ভবত তাঁর নিজের গুরু বলেও মনে করেন—আমার আপত্তি নেই কারণ বর্তমান লেখকের ডঃ দাসের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে এবং ডঃ দাসের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁর সকল বন্ধুই তাঁকে 'গুরু' বলে মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না।

সবশেষে জানাই যে আমি সবিশেষ দুঃখ বোধ করছি আমার মূল প্রবন্ধটি তাঁর ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করতে পারেনি—আশা করছি এই চিঠিটি তাঁর ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে নিরসন করতে পারবে।

জ্যোতির্ময় দাশ, পাটনা ১

মথুরা প্রতিবাদের প্রতীক

১ জুন সংখ্যায় কিরণশঙ্কর মৈত্রের 'ধর্ষিতা মথুরা আজ প্রতিবাদের প্রতীক' পড়লাম।

২৬ মারচ ১৯৭২ মথুরার উপর যে অত্যাচার হয় তার জন্য নিম্ন আদালত, হাইকোরট ও সুপারিম কোরট ঘটনার বিচার বিবেচনা করার পর সুপারিম কোরটের সিদ্ধান্তে তুকারাম ও গণপত শুধু বেকসুর খালাস পেল এটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল একটি ধর্ষিতা মেয়ের করুণ আবেদন কিভাবে উপেক্ষিত হল। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই রায়ের বিরুদ্ধে কোন বিচারক, কোন আইনজ্ঞ কোন প্রতিবাদ করেননি। কোন প্রতিষ্ঠিত উকিল এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি বলেই মহারাষ্ট্র সরকার এই রায় মেনে নিতে বাধ্য হন। আরও দুঃখের কথা একবছর পরে এই মামলার রিপোরট ছাপা হয় লখনৌর ইস্টার্ন বুক কোমপানির ল-জারনালে। যখন সর্বপ্রথম এই ঘটনা পড়ে যিনি বিচলিত হন তিনি হলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সী। তাঁর ভাষায়—'আমি এই ঘটনা পড়ে বিচলিত হয়ে পড়তে পড়তে কেঁদেছি।'—স্বচ্ছলেই বোঝা যায় তিনি কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি সহযোগী অধ্যাপিকা লতিকা সরকারকে এ বিষয়ে জানান। তাঁরা দুজনে তাঁদের অপর সহযোগী রঘুনাথ কেলকারকে নিয়ে বিষয়টির উপর আলোচনা করেন।

তারপর পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুধা ধাগওয়ারের সঙ্গে বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ করে প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড়কে এক খোলা চিঠি লেখেন। তাতে তারা আইনগত কিছু সূক্ষ্ম প্রশ্ন তোলেন এবং বিষয়টির পুনর্বিচার করার জন্য আবেদন জানান। এই পত্রের অনুলিপি তাঁরা সব সরকারী প্রচারবিভাগ, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার কাছে পাঠান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে এমন একটি অন্যায় বিচারের কথা জনসাধারণ জানতে পারে এবং এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তাঁদের উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে। আজ সারা ভারত এই ন্যক্কারজনক রায়ের বিরুদ্ধে উত্তাল। কিন্তু সুপরিম কোরট ঐ পত্র প্রাপ্তির কোন স্বীকৃতি দেননি। যে সব সরকারী পত্রপত্রিকায় এই চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছিল তারাও কোন মন্তব্য করেনি। কিছু কিছু সংস্থা আবার ঐ চিঠির নকল সরাসরি সুপারিম কোরটের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

আরও মজার কথা দেশের কিছু উচ্চ আদালতে ঐ চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছিল। ঐ সমস্ত আদালত কোন মন্তব্য করেনি। কোন উত্তরও দেয়নি। কারণ তারা উচ্চতম আদালতের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নারাজ।

যদিও সরকারীভাবে সুপরিম কোরট ঐ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে কোন উত্তর দেয়নি তবে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় কিন্তু হস্তাক্ষরকারী দুই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেন। আর একজন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ারকেও পত্রের অনুলিপি দেওয়া হয়। তিনিও এই ঘটনার পুনর্বিচারের সপক্ষে।

দেখা যাচ্ছে যদি সুপরিম কোরট এই বিচারের পুনর্বিচার করেন তবে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর সহযোগীদের মতানৈক্য ঘটে; আবার ঐ চিঠির বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালে ঐ পত্রের আইনগত ত্রুটিগুলির কথা স্বীকার করতে হয়। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা যায় না। তবে এইভাবে বিচারের নামে প্রহসন শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মানুষের কাছেও আমাদের রীতিমত লজ্জায় ফেলেছে।

এম এম ইয়াসিন, বাঁদপুর
হুগলী

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে

১৬ মের 'পরিবর্তন' পড়লাম। উক্ত সংখ্যাটির নিবেদিতা চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র টুকিটাকি' অনেক কিছু জানতে সাহায্য করল। কিন্তু কিছু প্রশ্ন আপনা থেকেই আমদানি হয়। এই সংক্ষিপ্ত রচনা পাঠ করে অনুমান করা যায়, নিবেদিতা দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং তাঁর কাছে অভ্রান্ত তথ্য আশা করব। তিনি লিখেছেন, 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক মহল থেকে আরেক মহলে গিয়ে কবি বিবাহ-বাসরে বসেছিলেন।' একটু বিস্তারিত হলে এই প্রশ্ন আর জাগত না যে, এক মহল থেকে আর এক মহলে গিয়ে কবি বিবাহবাসরে বসেছিলেন কেন। তাহলে কি কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী একই পরিবারের সদস্যা? নাকি পাত্রীকে ঠাকুরবাড়িতে তুলে এনে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হয়। পাত্রীর পরিচয় জানানো প্রয়োজন ছিল। পাত্রীর আসল নামও জানা প্রয়োজন। পদবীও জানতে ইচ্ছা করে। আবার নিবেদিতা দেবী বলেছেন, 'তাঁকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়নি প্রশ্ন জাগে 'কেন?' যদি একটু খোলসা করে লিখতেন, তাহলে রচনাটি পাঠ করে তৃপ্তি পেতাম।

মফিকুল হাসান, মাদপুর, হুগলী

লেখিকার বক্তব্য

আমার লেখা 'রবীন্দ্র টুকিটাকি' পড়ে মফিকুল হাসান মহাশয়ের মনে কিছু জিজ্ঞাসা ও সংশয় দেখা দিয়েছে। সংশয় নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। শ্রীহাসানের অনুমান ঠিক নয়—অর্থাৎ আমি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী নই। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর কিছু বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছিল সম্ভবত তাই থেকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাই ছোট ছেলের বিয়েতে ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিসাবে যতখানি ঘটা করার কথা তা হয়নি

যশোর জেলার ফুলতলির মেয়ে ভবতারিণীকে বিবাহ করতে রবীন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে যাননি বরং কন্যাকে আনা হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। তখনকার দিনে খানদানি পরিবারে এসব রেওয়াজ বিরল ছিল না। নিজের বাড়িতেই পশ্চিম বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ অন্দরমহলে বিয়ে করতে এসেছিলেন। এই ভবতারিণীই ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে মৃণালিনীতে রূপান্তরিতা হলেন। বিবাহ-পূর্বকালে ইনি ঠাকুরবাড়ির সদস্যা বা, আত্মীয়া ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন—'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই……যা তা করে হয়েছিল।' ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ বউ এসেছে যশোর থেকে। প্রথম দিকে খুব মেয়ে দেখার ধুম পড়েছিল কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী বেণীমাধব রায়ের বড় মেয়ে ভবতারিণীই রবীন্দ্রনাথের ভাবী বধূ রূপে মনোনীতা হলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্যা 'স্বর্ণ মৃণালিনী' পরবর্তীকালে মৃণালিনী হয়ে গেলেন।

নিবেদিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর

এবার কুড়ি টাকা সম্মানিক পাবেন
স্বনীলকুমার মাহাত



কার্টুন ঃ রঞ্জিত

অম্লমধুর

এতো বড় রঙ্গ যাদু এ তো বড় রঙ্গ
চার কালো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ



বাজার কালো, রূপেয়া কালো, কালো নেতার হাত
তাহার অধিক কালো কন্যে, লোডশেডিং-এর
রাত।

সুকুমার চৌধুরী

★

কোন্ দেশেতে মানুষগুলোর
মর্জি মেজাজও বদরাগী
কোথায় মানুষ ধান্দা খোঁজেন
সুযোগ খোঁজেন নিজের লাগি ?
রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে
দিয়েই হই হাল্কা রে
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলারে…

দেবাশিস্ প্রধান

★

রাইটারেরা খেতাব পাবেন
লিস্ট করেছেন রাইটার্স,
কাজ রেখে সব ঝাণ্ডা ওড়ান—
প্রগতিশীল ফাইটার্স ॥

কার্ত্তিক ঘোষ

★

ববকাট্ চুল আর
টপ্‌কাট জামাতে
গট্‌গটে মেয়েদের
কে পারবে থামাতে ?
হাইহিল খিলখিল
গুলগুলে দৃষ্টি,
প্রকাশ্য কটিতটে
কারিগরি কৃষ্টি।



গালে টোল মিঠে বোল
ঢুলু ঢুলু চলিতং—
ন্যাকা ন্যাকা গলাগলি
চুলবুলি চলিতং।

অনার্য মিত্র

যৌতুকের বিরুদ্ধে মেয়েদের জোটবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে

জসবন্তীর বয়স তখন মাত্র ষোল। ক্লাস নাইনে পড়ে। বাপ-মা দেখেশুনে নাংগলোই-এর রবীন্দ্রকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন জসবন্তীর। সেটা বছর দুয়েক আগের কথা। বিয়েতে বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন জসবন্তীর বাবা। মেয়েকেও দিয়েছিলেন অনেক কাপড়, গয়না, থালাবাসন আর বরের জন্য নগদ টাকা ৫০০০। কিন্তু রবীন্দ্রকুমারের পরিবারের খাকতি কমেনি তাতে। রোজ জসবন্তীকে নির্যাতন করা হতো শ্বশুরবাড়িতে। গত বছর জুন মাসের এক সকালে জসবন্তীর বাবাকে খবর পাঠান হয়। জসবন্তী মারা গেছে। অযোধ্যা সিং নাংগলোই গেলেন। জসবন্তীর ফুটফুটে চেহারা চেনবার উপায় নেই। পোড়া কালো চামড়ার ফাঁক দিয়ে তখনও তাজা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। বীভৎস দৃশ্য। চিৎকার করে ফুঁপে কেঁদে ওঠে অযোধ্যা সিং। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলল, 'মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। তাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছিল দোর বন্ধ করে।'

জসবন্তীর মা সন্তরা কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন—তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুড়িয়ে মেরেছে। জসবন্তীর মৃত্যুকে শুধু সন্তরাই নয়, শাহপুর জাঠের কোন মানুষই এখনও ভুলতে পারছে না। দিল্লির পুলিশ কমিশনার থেকে আরম্ভ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত সবার কাছে আবেদন জানান হচ্ছে সুবিচারের জন্য। বিভিন্ন মহিলা সংগঠন জসবন্তীর 'হত্যা'কে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে আন্দোলন শুরু করেছে।

এমন দিন কমই, যার কোনদিন কোন বৌকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে অথবা সে 'আত্মহত্যা' করেছে এমন খবর দিল্লির কাগজে থাকে না। সারা দেশের অবস্থা তাহলে কী তা কল্পনা করাও কঠিন।

গত ১৮ মাসে দিল্লিতে ১০৮ জন মহিলা 'আত্মহত্যা' করেছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে দিল্লি এলাকায় ৯০ জন মহিলা পর্যাপ্ত যৌতুক না দেওয়ায় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মারা যায় বা তাদের হত্যা করা হয়। কয়েকটা ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক।

৩১ মার্চ, ১৯৮০। দিল্লির লরেন্স রোড। তিন কামরার বাড়ির এক কামরায় নির্মলা মেহরোত্রা দুপুরে খিল তুলে দেন। নির্মলার বয়স মাত্র ৩০। দেড় বছরের একটা ছেলেও আছে। শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। বাড়িতে সেদিন শাশুড়ি ছাড়া চাকর-বাকরও ছিল। হঠাৎ পাড়ার লোকে জানলা দিয়ে আগুন দেখতে পায়। পুলিশ আসে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার পরে দেখা যায়—নির্মলা পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। শরীরে প্রাণ নেই। শাশুড়ী পরে বলেন তিনি টের পাননি কিছুই!

১৫ এপ্রিল, ১৯৭৮। স্থান কলকাতার মেটিয়াবুরুজ থানা অঞ্চলের দত্তবাগান। অণিমা চ্যাটার্জি থাকতেন তার স্বামী সুব্রত চ্যাটার্জি, শাশুড়ি, ৯ বছরের ছেলে আর ১১ বছরের মেয়ে নিয়ে। অণিমা দেবীর ভাই গোপাল চাকলাদারের জবানীতে শোনা যাক বাকিটা। আলিপুর কোর্টে গোপাল-বাবুর জবানী অনুযায়ী, অণিমা দেবী তার স্বামী আর শাশুড়ির অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গায়ে কেরোসিন

সুদীপ মজুমদার

ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। পাশে একটা জলসা হচ্ছিল। সেখান থেকে লোকজন ছুটে এসে বাড়ির দরজায় ঘা মারে। দরজা খুলে সুব্রত চ্যাটার্জি দাঁড়ায়। ভেতরে অণিমা দেবীর সারা শরীর জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। শাশুড়ি চারুবালা নিশ্চিন্তে ঘরের কাজ করতে ব্যস্ত। অণিমা দেবী নাকি পাড়ার লোকদের চিৎকার করে বলেন ওকে মেরে ফেলার জন্য. কেন না অগুনের জ্বালা আর সহ্য হচ্ছিল না। কয়েকজন লেপ দিয়ে জড়িয়ে অণিমা দেবীর শরীরের আগুন নেভান। অতঃতাড়ি ওকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন পরে অণিমা দেবী মারা যান। মরা যাওয়ার আগে এক জবানীতে তিনি বলে যান—স্বামী আর শাশুড়ির নির্যাতনই তাকে বাধ্য করেছে নিজের প্রাণ নিতে। আদালতে ওর ছেলে কি করে ওর মাকে অত্যাচার করা হতো তার বিবরণ দেয়। সুব্রত ও চারুবালা দুজনেই অবশ্য জামিনে খালাস পেয়ে যান।

কেরালার মেয়ে পি বলসলা। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বলসলার বিয়ে হয় কেরালারই এম চন্দ্রর সঙ্গে। চন্দ্র বিহারে রাঁচীর কাছে ডাকারা কালিয়ারীতে কাজ করত। বিয়ের সময় বলসলার বাবা নায়ারবাবু কাপড়-জামা গয়না ছাড়াও ১০০০ টাকা নগদ দেন চন্দ্রর পরিবারকে। বিয়ে করে চন্দ্র, বলসলাকে রাঁচী নিয়ে আসে। তারপর কয়েক মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় তাড়না। বাপের বাড়িকে গালাগাল। নায়ারবাবু মেয়ের সংসার বাঁচানর জন্য আরও ১০০০ টাকা পাঠান চন্দ্রকে। নায়ারবাবু সামান্য চাকুরে। বাড়িতে আরও পাঁচটি মেয়ে ও এক নাবালক ছেলে আছে। একবার প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর বলসলা চলে আসে বাপের বাড়ি। চন্দ্র রোজ খোঁটা দিত টাকা পয়সা আনার জন্য। গত বছর মে মাস নাগাদ চন্দ্র শ্বশুরবাড়িতে এসে ফন্দি করে বলসলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় রাঁচীতে নিজের কাছে। বলসলা রাঁচী ফিরে যায় মে মাসের ১৩ তারিখে। ঠিক চারদিন পর এক দুপুরে বলসলাকে পাওয়া যায় রাঁচীর বাড়িতে কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায়। নায়ারবাবু টেলিগ্রাম পান 'Valsala expired come soon'। তিনি ছুটে যান রাঁচী। কিন্তু তিনি পৌঁছানর আগেই শেষকৃত্য করে ফেলা হয়েছে। আকুল হয়ে তিনি ছুটে যান কাছের পুলিশ স্টেশনে। কেউ সেখানে ছিল না তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শুনতে। বিচার তো দূরের কথা।

রাকেশ কুমারীর বিয়ে হয় ২১ বছর বয়সে। ওর বাপের বাড়ি সুদূর পাঞ্জাবের ফরিদকোট জেলার কোথকা-পুরা গ্রামে। বিয়ের সময় খরচাপাতি আর যৌতুক হিসাবে ২৫ হাজার টাকা লাগে। বিয়ে হয় ১৪ আগস্ট ১৯৭৮ সনে। ঠিক তার দু' সপ্তাহ পরে দিল্লির করোলবাগের শ্বশুরবাড়িতে রান্নাঘরে রাকেশকে পুড়িয়ে মারা হয়। যখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর কাঁচা মাংসের পোড়া গন্ধ নাকে আসছিল তখন পাড়ার লোকেরা বাড়ির সামনে ভিড় করে। তারা বলে রাকেশকে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুড়িয়ে মেরেছে 'অপর্যাপ্ত যৌতুক' আনার জন্য। রাকেশের ভাই বিনোদ তিনদিন হন্যে হয়ে ঘুরেও পুলিশের কাছে FIR লেখাতে পারেনি। পুলিশ সোজা বলে দিয়েছিল—'এসব কেসে কিছুই হয় না।' পাড়ার লোকে বলে পুলিশ পয়সা খেয়েছে। আর রাকেশের বর আবার বিয়ে করার চেষ্টা করছে।

মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারার এক বছর পরেও আবদুল গফুর আজও বোবা হয়ে বসে থাকে যখন কেউ ও কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নূরজাহানের তখন ১৬ বছর বয়স। ওর রূপ অনেকের ঈর্ষার কারণ হতে পারত। আবদুল দিল্লির এক বস্তিতে পরিবার নিয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রীর কাজ পায়। সংসার কোন মতে চলে। তাই যখন সেলিমের সঙ্গে নূরজাহানের বিয়ের কথা ওঠে আবদুল আনন্দে মশগুল হয়ে যায়। বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হয় অত্যাচার। নূরজাহানের স্বামী, শাশুড়ি, এমন কি ছোট ছোট দেওরগুলোও প্রথমে অপমান তারপর দৈহিক অত্যাচার শুরু করে। ওদের রাগ, নূরজাহান কেন বেশ কিছু টাকাকড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেনি। নূরজাহানের কালো বড় বড় চোখ দুটি কাঁদতে কাঁদতে ফুলে ওঠে। পিঠে কালশিরা। হঠাৎ গত বছর ২৪ মে, নূরজাহানকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তারপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ওর শরীরে। নূরজাহান মারা যায় কিছুক্ষণের মধ্যে। আবদুল আর তার বিবি পাগলের মত ছুটে যায় এর কাছে ওর কাছে ওদের বুকফাটা আর্তনাদ নিয়ে। কিন্তু তিনদিন তো পুলিশ ওদের রিপোর্টই লিখল না। বরং শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে এক নালিশের জন্য আবদুল গফুরের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার কেস শুরু হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে যখন পাঞ্জাবী বাগ পুলিশের কাছে খোঁজ নিলাম, নূরজাহানের কেসের ব্যাপারে পুলিশ বলল 'নূরজাহান আত্মহত্যা করেছিল। তাই ও কেস বন্ধ। হ্যাঁ তবে আবদুল গফুরের বিরুদ্ধে কেস এখনও চলছে।'

আবার কলকাতা। এবার কাশীপুর থানার হরিশচন্দ্র পাল লেনের ঘটনা। বিয়ের রাতেই সুজাতা বোস শ্বশুরবাড়ির লালসার শিকার। শিয়ালদার ম্যাজিস-ট্রেট অসিতকুমার বিশ্বের আদালতের সামনে সুজাতা সেই ভয়াবহ রাতের কথা বলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে। নারায়ণ সাক্ষী রেখে সুজাতার বিয়ে হয় সুভাষ বোসের সঙ্গে গত বছর মে মাসের ২৪ তারিখে। সুজাতার দাদা দীপক বর্মণ, ১১ হাজার টাকা নগদ, আলমারী আসবাব, টি ভি সেট আর ২০ ভরি সোনা দেন বিয়েতে। নেমন্তন্ন বাড়ির লোকজন চলে গেছে। ফুলশয্যার রাত। সুজাতার ঘরে ঢোকে সুভাষ ও তার 'মেশোমশায়'। দুজনেই মত্ত। সুভাষ হাঁক ছাড়ে 'জামা খোল'। সুজাতা ভয়ে লজ্জায় সিঁটিয়ে যায়। ওর স্বামী বলে 'মেশোমশায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে'। প্রতিবাদ করে কান্নায়, দুঃখে, রাগে ফেটে পড়ে সুজাতা। মাতাল 'মেশোমশায়' টলতে টলতে কামরা ছেড়ে চলে যায়। আর সুভাষ রাগে চিৎকার করে ওঠে। পরে সুজাতা জানতে পারে যে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অ্যামবাসাডার গাড়ি চায় যৌতুক হিসাবে। সুজাতার ওপর অত্যাচার বাড়ে। ভয়ে ভয়ে ওর প্রহর কাটে। একদিন রাতে শাশুড়ির হাত থেকে জলের গ্লাস নেবার পর ছুঁড়ে ফেলে



যৌতুকের প্রশ্নে মেয়ে পোড়ানো বন্ধ করো—এই দাবিতে নাংগলোই থানার সামনে মেয়েরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন নিহত জসবন্তীর মা এবং শাহপুর জাঠ বস্তির মহিলা সংগঠনের কর্মীরা।



দেয় সুজাতা এই ভয়ে যে ওতে বিষ আছে। পরদিন সকালে পোষা বেড়ালটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে ওই জলের ওপর। সুজাতা তার জবানীতে এও বলে যে একদিন রাতে সুভাষ ওকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করে। চিৎকারে পাড়ার লোক এসে পড়ে। পুলিশও আসে। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করে না। সুজাতা তার কাহিনী বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে আদালতে।

এরকম অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে সারা দেশ জুড়ে। যদি শুধু প্রত্যেক ঘটনার সামান্য বিবরণও দেওয়া হয় তবে কয়েকটা মোটা মোটা বই হয়ে যাবে। নারী নির্যাতনের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটা হল 'অপর্যাপ্ত যৌতুক' আনার জন্য বৌকে অত্যাচার করা এবং শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হয় পুড়িয়ে না হয় অন্য প্রকারে মেরে ফেলা যাতে পুরুষ আবার 'যৌতুক' পেতে পারে।

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন—যে ঘটনাগুলো শহরে ঘটে একমাত্র সেগুলোরই কিছু অংশ খবরের কাগজে ছাপে। এ ধরনের আরও বর্বর ও নৃশংস ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে গ্রামে গ্রামে। সেসব খবর খবরের কাগজে পাত্তাই পায় না।

বৌ-পোড়ান অনেকে হয়ত মনে করবেন যে শুধু উত্তর ভারত এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীগুলির মধ্যেই হয়। কিন্তু কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী গবেষণার রিপোরটে দেখা যায়—নানান কারণে বাড়ির বৌ-এর ওপর অত্যাচার সমাজের সব শ্রেণীতে এবং সব প্রদেশেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে চলেছে।

এমনও অসংখ্য ঘটনা আছে যা 'লোকে কি বলবে' এই ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরোয় না। অনেক বাড়ির বউ নির্যাতন, অপমান আর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করার কথা ভাবেন। যাদের সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় তারা আত্মহত্যা করেন। অনেককে তো শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মেরে ফেলে। আর বাকিরা সমাজ, সন্তান, মা-বাবার কথা ভেবে নীরবে সব অপমান, লাঞ্ছনা বহন করে এক নারকীয় জীবন যাপন করেন।

কিন্তু এমন কেন হয়? দিল্লীর মহিলাদের সংগঠন Manushi Collective মনে করেন এর পেছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। 'মানুষী কালেকটিভের' মধু কিশওয়ার বলেন, 'ভারতে নারী জাতিকে অত্যাচার ও বাচ্চা মেয়েদের হত্যা করা বহুদিন ধরে চলে আসছে। আগে হতো সতীদাহ আর মেয়ে জন্ম হলে নুন অথবা অন্য কিছু দিয়ে মেরে ফেলা। পুরো হিন্দু শাস্ত্র বিশেষত মনুসংহিতা নারী জাতিকে ইতর হিসাবে দেখাতে চায়। প্রাচীনকাল থেকেই স্ত্রীকে স্বামীর দাসী আর সেবা করার কাজই দেওয়া হয়েছে। মেয়েরাও যে মানুষ তা স্বীকার করতে আজকালও অনেকেই চায় না।'

মধু বলেন, 'পুঁজিবাদী সমাজে ভোগ্যপণ্যের সব চাইতে কদর। Consumerism আজ মানুষের মধ্যে টি ভি, রেডিও, খাট, আলমারী ইত্যাদির মোহ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রচার ব্যবস্থায় নারীকে পণ্য হিসাবে দেখান হয়। সিনেমা, থিয়েটার মায় সাহিত্যে পর্যন্ত নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখা যায়। পুঁজিবাদী সমাজে প্রত্যেক ভোগ্যপণ্য টাকার দরে বিচার হয়।'

অঞ্জলি দেশপাণ্ডে 'যৌতুক বিরোধী মহিলা সংঘের' সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, "একদিকে ভোগ্য পণ্যের ওপর ক্রমবর্ধমান লালসা অন্যদিকে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে চিন্তা করা—এই দুই মিলিয়ে টি ভি, গাড়ি বা ফ্রিজ-এর চাহিদা দেখা দেয় বিয়ের সময়। তাছাড়া নগদ তো আছেই। এর কমতি হলেই নির্যাতন ও শেষ পর্যন্ত হত্যা, যাতে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারে। আর এক খেপ যৌতুক পাবার লালসা। এবারে বোধহয় স্কুটার অবশ্যই পাওয়া যাবে।'

দিললিতে গত চার মাসে ২৯টি 'যৌতুক সংক্রান্ত' মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১২ জন পুরুষ আবার বিয়ে করার চেষ্টা শুরু করেছে।

১৯৬১ সালে Dowry Prohibition Act চালু করা হয়। এই আইনের মারফত যৌতুক নেওয়া ও দেওয়া দুই অপরাধ। কিন্তু যৌতুক চাওয়া বা দেওয়া কি কমেছে? সবাই বলবেন, না। আজকাল আই এ এস, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার পাত্রর দাম অনেকেরই জানা। দরে না পোষালেই বৌ পোড়াও। পুলিসের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে কেস চাপা দেওয়া দিব্য চলে। জসবন্তীর বেলায় ঠিক তাই হয়। পুলিশের মতে সে আত্মহত্যা করেছিল। তাই সবকটি মহিলা সংগঠন একজোট হয়ে 'জসবন্তী হত্যার' বিচার চাইছে। মিটিং, মিছিল, ধরনা চলছে দিল্লিতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

'পুলিশের বা সরকারী অফিসারদের মাথায় কি একবারও আসে না যে ফুটফুটে একটা ১৬ বছরের মেয়ে হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করতে চাইবে? আর যদি আত্মহত্যা করেওবা তাহলে তার পিছনে কারণগুলি কি? কোন মানুষই মিছিমিছি মরতে চায় না।

অঞ্জলি দেশপাণ্ডে বলেন, 'আমাদের সংস্কার হল মেয়েদের ইতর করে দেখান হয়, অবলা বলা আর পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়। যতদিন না একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ করা হয় ততদিন এই অত্যাচার চলবে। তার ওপর আছে পুঁজিবাদের পণ্যবাদ। বিয়ের প্রথাগত কু-প্রভাবও (যেখানে সবকিছু নির্ভর করে দেনা-পাওনার ওপর) দূর করতে হবে।'

কয়েকটি মহিলা সংগঠন সম্প্রতি এক সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে এই ভয়াবহ সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য নারীদের এক হতে হবে। এই সমাজ যা সবকিছু টাকা-পয়সার দ্বারা বিচার করে তাকে এক সঙ্গে আঘাত করতে হবে। আইন বদলালে চলবে না। বিবাহ-ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। আর সবচাইতে বড় কথা নারীও যে মানুষ ও পুরুষের সমকক্ষ একথা প্রমাণ করতে হবে।'

★

আটবছর পরে আবার ঢাকায়। প্রথম ঢাকা পৌঁছেছিলাম ১৭ ডিসেমবর ১৯৭১-এ। ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ঢাকা সেদিন মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর জয়গানে মুখরিত। ভারতীয় মাত্রই সেদিন বন্দিত। এবারের আগে ঢাকার পথে আমার শেষ বিমান যাত্রা ২১ ফেবরুয়ারি ১৯৭২। সেদিন বিমানে সহযাত্রী ছিলেন সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক।

আট বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে একাধিক বার। বঙ্গবন্ধু নেই, তাঁর দল আওয়ামী লীগও ক্ষমতাচ্যুত। এখন পদ্মা, শীতলক্ষ্যা বুড়িগঙ্গায় নতুন ঢেউ, রাষ্ট্রনায়কদের রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পরিবর্তনের প্রমাণ মিলল বাংলাদেশ বিমানের বিমান-বালিকার ঘোষণায়—ইনসাল্লা. আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমরা ঢাকা পৌঁছব। বিদায় দেবার সময়—'খোদা হাফেজ'। সরকারী ভাবে ঘোষিত ইসলামিক রাষ্ট্র না হলেও বাংলাদেশ এখন মোটামুটি ইসলামিক দুনিয়ার সঙ্গে একাত্ম। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, বেতারে টিভিতে কোরাণ পাঠ দিয়েই শুরু হয় অনুষ্ঠানসূচী, ঢাকার ইন্টার কনটিনেনটাল হোটেলে আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হল মৌলবির কোরাণ পাঠ দিয়ে। কেতাদুরস্ত তরুণ তথ্য ও বেতারমন্ত্রীও তাঁর ইংরাজি ভাষণ পাঠ করার আগে খোদার গুণকীর্তন করে নিলেন। মনে পড়ে গেল—১৯৭২ সালে একদিন শখ করে মাথায় জিন্না টুপি পরে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, বাংলাদেশী বন্ধুরা সেদিন আমায় লজ্জা দিয়েছিলেন, 'ছি-ছি, করেছেন কি; যে পাকিস্তানী পোশাককে আমরা ত্যাগ করেছি চিরতরে, আপনি কিনা সেই টুপি …।' অপ্রস্তুত হয়ে

ঢাকায় দোতলা বাড়ির মাসিক ভাড়া ১৫ হাজার টাকা



বাংলাদেশ-প্রত্যাগত বিশেষ প্রতিনিধি

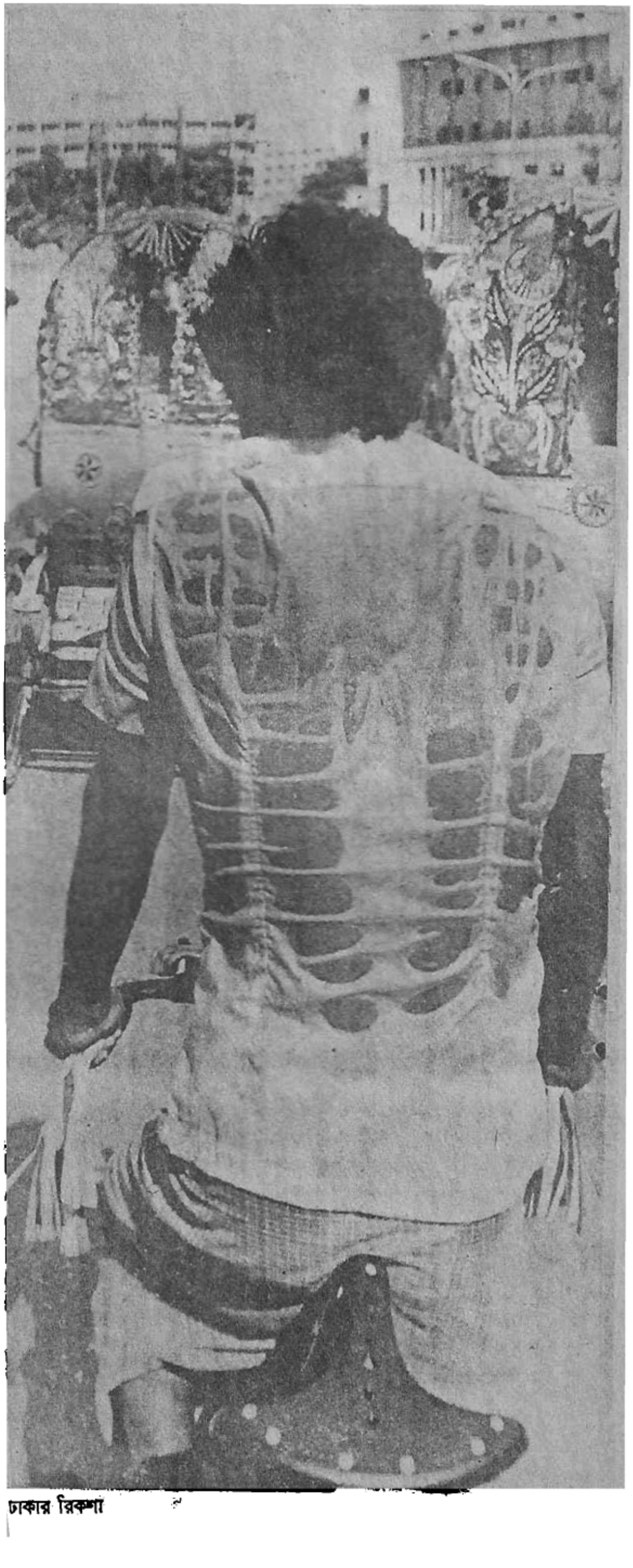
জিন্না টুপি তৎক্ষণাৎ শিরচ্যুত করেছিলাম। কিন্তু এবার দেখলাম অনেকেই শিরোধার্য করেছেন সেই টুপি সঙ্গে চোগা চাপকান। একজন মন্ত্রীকেও দেখলাম ওই পোশাকে।

ঢাকা বিমান বন্দরে পা দিয়েই অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। ঢাকা এখন আন্তর্জাতিক এয়ার পোর্ট। এখান থেকে পুব-পশ্চিম যেদিকে ইচ্ছে উড়ে যাওয়া যায়। এয়ার পোর্টের পুনর্বিন্যাস হয়েছে ফরাসি কনস্যালটানটদের প্ল্যান মাফিক, কিছুকাল আগে প্রেসিডেনট জিয়া উদ্বোধন করেছেন। নতুন দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি হয়েছে।

আট বছরে ঢাকা শহরের চেহারাও অনেক পালটে গেছে, চওড়া হয়েছে প্রায় সব রাস্তা, মাঝখানে বুলভার। লাইট পোসটের মাঝে মাঝে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন, পথে পথে অনেক বিদেশী মোটর গাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে এসেছে ঝকঝকে ভাব, বেড়েছে রিকশাও। শুনলাম—লাখ খানেকের ওপর রিকশা চলে ঢাকায়। কোথাও কোথাও রিকশার জন্য আলাদা ট্র্যাক করা হয়েছে। সব রিকশার ছাউনিতে একই রঙ। দেখতে ভালই লাগে। ট্যাকসি কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবে তিন চাকার অটো রিকশা অনেক। বাস সারভিসের উন্নতি হয়নি। বাইসাইকেলও তেমন পপুলার নয়। তাই রিকশাই বড় ভরসা। ভাড়াও বেশি নয়।

আকাশ-ছোঁয়া দাম

সেবার আমি 'পূর্বাণীতে' ছিলাম। এবারও উঠলাম সেখানে। হোটেলটি আটবছরে আকারে বা আয়তনে বাড়েনি, তবে আরও সমৃদ্ধ



ঢাকার রিকশা

হয়েছে। ঘর ভাড়াও বেড়েছে প্রচণ্ড। এর একটি ঘরের ভাড়া এখন হংকং বা ওয়াশিংটনের সমপর্যায়ের হোটেল ভাড়ার সমান। রেসটুরেনটে ঢুকে দেখলাম খাবারের দামও আগুন। ভাত ও দই ইলিশ খেলাম; বাংলাদেশের ছত্রিশ টাকা বিল উঠল। তিন কোরসের লানচ খেতে হলে একশ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সাধারণ রেসতোরাঁয় খাবারের দাম এত নয়। শুনলাম ঢাকায় জাপানি কোলাবরেশনে একটি বড় হোটেল হচ্ছে। তবে ছোট ও পরিচ্ছন্ন হোটেলের অভাব আজও মেটেনি।

ঢাকার জীবনযাত্রা চলছে স্বাভাবিক গতিতেই। কিন্তু সকলের মুখেই একটি কথা—প্রচণ্ড দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বেতন কাঠামো ভারতের মতই। অথচ টাকার দাম ভারতীয় টাকার অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি। মারচের শেষে দেখেছি—চালের সের পাঁচ টাকা। ভাল চাল ছ'টাকা। তেল ২৫ টাকা। ঢাকায় একটি মর্তমান কলা বারো আনা, একটি কমলা দুটাকা, সাধারণ হোটেলে মাছ ভাত দশ টাকা। জুতো পালিশ বারো আনা থেকে এক টাকা। বাড়ি ভাড়া বেড়েছে প্রচণ্ড। ঢাকায় শুনলাম একটি আধুনিক দোতলা বাড়ি পুরো নিলে ভাড়া মাসে পনেরো হাজার টাকা। এই প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির পিছনে আছে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা যা আসছে সাহায্য হিসাবে এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের পাঠানো টাকায়। অথচ শিল্পোৎপাদন আনুপাতিক হারে ঘটছে না।

শিল্পোন্নয়ন

শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·১ ভাগ। দেশের বেশির ভাগ মানুষই এখনও কৃষি নির্ভর। পর্যাপ্ত সেচ ও উন্নত কৃষিপদ্ধতির অভাবে কৃষির উৎপাদনও সন্তোষজনক নয়। শতকরা ৩০ জন কর্মক্ষম ব্যক্তি বেকার। বর্তমান সরকার মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তারা চান দেশে প্রচুর বেসরকারী শিল্প হোক। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের শিল্পগুলি ছেড়ে চলে যায়। ওই সব শিল্প তড়িঘড়ি করে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে শিল্পগুলি লোকসান দিতে থাকে। জিয়া সরকার এখন বহু শিল্প বেসরকারী মালিকদের কাছে নীলাম ডেকে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

১৯৭৬ সালে সরকারী নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে আর কোন বেসরকারী শিল্প জাতীয়করণ করা হবে না। পাবলিক সেকটরে আট ধরনের শিল্প রেখে দেওয়া হবে বলা হয়েছে। এই আটটি শিল্প হল : আণবিক শক্তি, পাট শিল্প, কাপড়, চিনি, বিমান, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার যন্ত্র ও বিদ্যুৎ। বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ২০টি শিল্প তৈরি হতে চলেছে। এখন যেসব শিল্প বাংলাদেশে রয়েছে সেগুলি হল, পাট (পাটজাতদ্রব্য ও কাঁচা পাটের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এই শিল্পের অবস্থা খারাপ), কটন টেকসটাইল, স্টিল রোলিং মিল, মেশিন টুলস, ইলেকট্রিক দ্রব্য, হাইডক ও স্টিল মিল, সার, নিউজপ্রিনট, চামড়া, প্লাসটিক ফাইবার, কাগজ কল, চিনি ও চিংড়ি মাছের কারখানা।

সরকার আগামী দুবছরের জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়েছেন। বড় উদ্যোগের মধ্যে ঢাকার কাছে একটি বড় সার কারখানা গড়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বব্যাংক তাদের টাকা দিয়েছেন। জয়দেবপুরে তৈরি হচ্ছে একটি বড় ডিজেল প্ল্যানট। চট্টগ্রামে সোভিয়েত সহযোগিতায় জেনারেল ইলেকট্রিক তৈরি কারখানা গড়ে উঠছে।

বিদেশী জিনিসে ছয়লাপ

বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে বিশ্বের প্রায় সব দেশের জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। জাপানি টয়োটা থেকে চীনা রুমাল, হংকং-এর খেলনা থেকে ডেনমার্কের গুঁড়ো দুধ, জারমান টি ভি থেকে ব্রিটিশ ব্রেড। কুমিল্লার পথে ফেরিঘাটেও দেখলাম ৫৫৫ সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। পেপসি ও কোকাকোলা বাংলাদেশে বটলিং প্ল্যানট তৈরি করেছে। ক্যানে করা কোক এবং বিয়ারও বহু দোকানেই পাবেন।

বিদেশী জিনিসপত্রের দামও প্রচুর। সিগারেট এক প্যাকেট বাইশ টাকা, কোক মফঃস্বলে চার টাকা, ঢাকায় তিন টাকা, শেভিং ক্রিম পঁয়ত্রিশ টাকা, ব্লেড সাত-আট টাকা, ম্যাসোনাইটের ব্রিফকেস ১৯০০ টাকা। বিদেশী কাপড়ে একটি বুশ শারট করালে খরচ হাজার টাকা। একটি টয়োটা মোটর গাড়ি একলক্ষ থেকে দেড়লক্ষ টাকা।

বিদেশী জিনিসপত্র আসছে ওয়েজ আর্নার স্কিমে। অর্থাৎ সরকার দেশের কোন টাকা দিয়ে এইসব মাল আমদানি করবেন না। বিদেশে যে সব বাংলাদেশী টাকা রোজগার করছেন তারা বাংলাদেশের কোন ব্যাংককে বিদেশী মুদ্রা পাঠালে কোন আমদানিকারক সেই মুদ্রা কিনে ওই টাকায় বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পারেন। ধরুন আপনি একটি গাড়ি আমদানি করতে চান। আপনাকে খোঁজ রাখতে হবে কোন প্রবাসী ডলার বেচতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে বহু এজেন্সি গজিয়ে উঠেছে। ব্যাংক কর্মচারীদের সহযোগিতায় এই সব এজেন্সি এখন ডলার বেচার কাজে পারদর্শী হয়ে উঠছেন। তাদের প্রাপ্য কমিশন, এদিক ওদিক টু-পাইস ও শুল্ক ধরে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে।

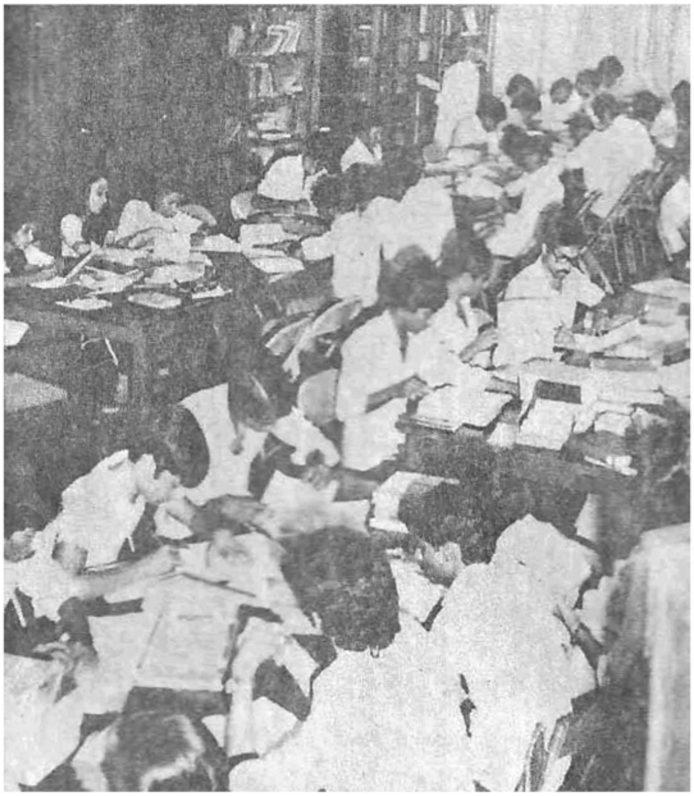
বিদেশী জিনিস অবাধে দেশে আসায় দেশের শিল্প খুব একটা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারছে না। অবশ্য আমদানিকৃত বস্তুর অধিকাংশই বাংলাদেশে তৈরি হয় না। কিন্তু যেগুলি হয় সেগুলির গ্রাহক শুধু গ্রামাঞ্চলে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদেশী জিনিসই কিনে থাকেন।

আরব দেশে ষাট হাজার

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে প্রচুর টাকা



ফলের বাজার : ঢাকা



ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের পাঠাগারে পড়ুয়াদের ভিড়

পয়সা এসেছে। যারা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত এবং যাদের আত্মীয়স্বজন বিদেশে আছেন তাদের অবস্থা রমরমা। প্রায় ষাট হাজার বাংলাদেশী আরব দেশগুলিতে আছেন। বিভিন্ন এজেন্টদের সহায়তায় আরব দেশগুলি বাংলাদেশী শিক্ষিত কারিগরদের আরবে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে চটকলের একজন কর্মকর্তা বললেন: আমরা একজন ভাল ট্রাক ড্রাইভার পাইনা, কারণ আরব দেশে দক্ষ ট্রাক ড্রাইভাররা চলে যাচ্ছেন। অনেকেই বললেন: এই আরব-টাকা আমাদের জমির দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঢাকায় এখন একটি বাড়ি তৈরির খরচ জমি ধরে সাত আট লাখ টাকা। তা সত্ত্বেও ঢাকায় বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। একজন বললেন, এখন একটা ইঁটের দাম এক টাকা। পেটরোলের গ্যালন ৪০ টাকা।

স্বাধীনতার পর রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বহু সেতু, কালভার্ট হয়েছে, কিন্তু গ্রামে এখনও ব্যাংক, কোঠাবাড়ি, সিনেমা হল, সমৃদ্ধ বাজার তেমন চোখে পড়বে না। তবে জেলা শহরগুলির উন্নতি হচ্ছে। কুমিল্লায় দেখলাম নতুন টেকনিক্যাল কলেজ হয়েছে, অনেক বাড়ি উঠেছে। সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ে সেটা পরিচ্ছন্নতা। জেলা শহরেও চওড়া রাস্তা এবং ফুটপাথ মোটামুটি একটা ছিমছাম ভাব।

ভারত-বাংলা সম্পর্ক

টিকাটুলিতে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। গতবার মিশনের হতশ্রী চেহারা দেখে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় মূল মন্দিরের সামনের মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আবার মিশনের কাজকর্ম শুরু হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে। নতুন বাড়ি উঠেছে; তৈরি হয়েছে নতুন সংস্কৃতি ভবন। ওরা কিছু কিছু বইও প্রকাশ করেছেন। গত আট বছরে স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু তরুণ সন্ন্যাস নিয়েছেন। তাদের সঙ্গেও কথা হল।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন এখন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল চালায়। স্কুলের ৫০০ ছাত্রের অধিকাংশই মুসলমান। কলেজ ছাত্রদের জন্য ওরা চালান একটি ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাস ও স্কুলের বাড়ি সম্প্রসারিত হয়েছে। মূল মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে। তৈরি হয়েছে গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ। জেলায়ও ওদের সেবাকেন্দ্র চলছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃতি ভবন পাঠগৃহে প্রতি বিকালেই সবগুলি আসন ভরতি হয়ে যায়। পাঠকের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র। অধিকাংশই মুসলমান। তারা এখানে আসেন পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা বই ও পত্র পত্রিকা পড়তে। তরুণদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে কোন গোঁড়ামির ভাব চোখে পড়েনি। মহারাজ বললেন: তাঁদের অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরাও আসেন। সন্ন্যাসীদের ভিসা পেতে বা মেয়াদ বাড়াতে এ পর্যন্ত কোন অসুবিধে হয়নি।

গুলসানে থাকেন ভারতীয় হাই কমিশনার মুচকুন্দ দুবে। ঢাকায় আসার আগে দুবে ছিলেন দিল্লি পররাষ্ট্র দফতরের বাংলাদেশ ডেসকে। উনি—বাংলাদেশের সংস্কৃতি ব্যাপারে খুব উৎসাহী; সব কবি সাহিত্যিকের নাম জানেন। তাঁদের অনেকের লেখার সঙ্গে পরিচিত। বললেন: পারেন তো ঢাকার থিয়েটার দেখে যাবেন। কয়েকটি গ্রুপ খুব উচ্চমানের নাটক প্রযোজনা করছেন।

সরকারের পরিবর্তন সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ভারত বাংলাদেশকে ১১৪ কোটি টাকার মত অর্থ সাহায্য করেছে। এর মধ্যে আছে ২০ কোটি ৫৮ লাখ টাকার অনুদান, বাকিটা বাণিজ্যিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক ঋণ। এছাড়া বাংলাদেশের খাদ্যসংকট মোকাবিলার জন্য ভারত দিয়েছে ৫০ হাজার টন গম ও দেড়লক্ষ টন চাল। এটা দেওয়া হয়েছে ঋণ হিসাবে। এছাড়া কলমবো পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে বাংলাদেশী কলা-কুশলীদের নিয়মিত ট্রেনিং চলছে। ১৯৭৯ সালেও ট্রেনিং নিয়েছেন ৭০ জন।

তবে দু-দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এখন খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তি এখনও বলবৎ আছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যাপারে ভারত যতটা উৎসাহী, বাংলাদেশ সরকার ততটা নন। এর ফলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক কার্যসূচী বাংলাদেশে এখন খুবই কম।

অথচ ভারতীয় ছায়াছবি, নাটক, চিত্রকলা দেখা, ভারতীয় শিল্পীদের গান শোনা কিংবা ভারতীয় বই পড়বার জন্য ও দেশে আগ্রহের অভাব নেই। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস একটি লাইব্রেরি চালায়। তার সদস্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ভারতীয় পত্র পত্রিকা পড়বার জন্য ওখানে সব সময় ভিড়। আমি যখন ঢাকায় তখন ওখানে ভারতীয় বই-এর এক প্রদর্শনী চলছিল। প্রদর্শনীর বই বিক্রির জন্য নয় বলে জনসাধারণ হতাশ হয়েছেন। দেখলাম ছাত্ররা প্রদর্শনীর বই থেকে বিভিন্ন অংশ খাতায় নোট করে নিচ্ছেন। সকলের প্রশ্ন—ভারতীয় বই কোথায় পাওয়া যাবে?

ঢাকায় অনেকে বুসটার লাগিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখেন। যশোর খুলনার লোকেরা নিয়মিত কলকাতার প্রোগ্রাম দেখেন, আকাশবাণী কলকাতার খবর ও সংবাদভাষ্য এখনও আগের মতই জনপ্রিয়। তবে ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়মিত দেখতে পান না বলে সকলের আক্ষেপ। ভারতীয় দূতাবাস কিছু ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন ফিলম সোসাইটির মারফৎ। ঢাকায় ৪২টি ফিলম সোসাইটি আছে। ফেডারেশন অফ ফিলম সোসাইটির এক মুখপাত্র বললেন: সোসাইটি 'সংসার-সীমান্তে' ছবিটি দেখাচ্ছেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, এখন

২৫ মারচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হল। জিয়া সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও গৌরবকে স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতা নিয়ে নানান কাগজে বহু স্মারক লেখা ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সরকারী কাগজের লেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের

ভূমিকার কোন উল্লেখ থাকে না।

আমাকে এক ভদ্রলোক বললেনঃ জেনারেল অরোরার কাছে জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করছেন—এ ছবিটি এখন আপনি আর কোথাও দেখবেন না। মুজিবপন্থী একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তিবাণী'তে ১৯৮০, ৬ এপ্রিল মোস্তফা সারওয়ার লিখেছিলেন—'ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধকে সহায়তা করেছে এই সত্য কথাটা স্বীকার করতে লজ্জার বা ভীতির কোন কারণ নেই।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তাদের অনেকেই এখন সরকারী দায়িত্বশীল পদে আছেন। অনেকে জিয়া সরকারের ক্যাবিনেটেও আছেন। মুজিব সরকারই শতকরা ত্রিশ ভাগ চাকরি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত করে গিয়েছিলেন; বিকলাঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা ও নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য স্থাপন করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ বোরড। এর ফলে প্রায় দু-তিন লাখ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে যারা পুনর্বাসিত হতে পেরেছেন তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা পারেননি তারা এখন আর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সমাজের কাছ থেকে কোন বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছেন না। তাদের সম্পর্কে একটা চাপা অভিযোগ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বললেনঃ ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় স্বাধীনতা না এনে আমরা দেশের ভেতর থেকে বিপ্লব সংঘটিত করে যদি স্বাধীনতা আনতে পারতাম তাহলে সে স্বাধীনতার ভিত্তি আরও মজবুত হত। এখনও আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বিদেশে আছেন। বিদেশ থেকে আর কোন আন্দোলন পরিচালনাকে আমাদের জনগণ ক্ষমা করবে না।

মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন আর যারা প্রত্যক্ষ অংশ নেননি এদের মধ্যে একটা ব্যবধান স্বাধীনতার পর থেকেই দানা বাঁধতে থাকে। মুজিবের সময় মুক্তিবাহিনীর লোকেরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। অনেকে লাইসেনস পারমিট নিয়ে তার অপব্যবহার করেন। তাদের অনেকের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুলোকের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। তাদের কারও কারও দুর্নীতিমূলক আচরণ জনসাধারণকে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

মুজিব সরকার ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'দালাল আইন' বলে একটি আইন করেছিলেন। ওই আইনে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে কারও যোগসাজস থাকলে তাকে গ্রেফতার করে ৬ মাস আটক রাখা যেত। কিন্তু মুজিব সরকারই সমস্ত দালালদের ক্ষমা করে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্বাসনের পথ মুক্ত করে দেন। এর ফলে দালাল আইন কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগসট মুজিব হত্যার পর খন্দকার মোশতাক সরকার দালাল আইনটি প্রত্যাহার করে নেন জনৈক প্রাবন্ধিক বলছেনঃ এর ফলে মুসলিম লীগ, জমাতে-ই ইসলামির মত গোঁড়া ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলির পুনরায় উজ্জীবন ঘটে। ক্রমে ক্রমে ৭১-এর যুদ্ধের চিহ্নিত এইসব দালালেরা প্রশাসনের উচ্চতম পদসমূহে আসন দখল করে বিভিন্ন সংগঠনের নামে

অভিযোগ—যেখানে দুলক্ষ ব্যক্তি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগের নেতারা নাকি ১১ লক্ষ লোককে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বলে সারটিফিকেট দিয়ে যান। ওই সারটিফিকেট দেখিয়ে নানান ব্যক্তি আখের গুছিয়ে নিয়েছেন।

এসব কারণে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে বড় করে দেখাতে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রাজি নন। চিত্র পরিচালক সুভাষ দত্ত 'মুক্তিবাণী' পত্রিকায় ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ছবিগুলি এখন আর প্রদর্শকেরা দেখাতে উৎসাহী নন। কারণ ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক গগনে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।'

শেখ মুজিবের স্মৃতি

শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ থেকে তাঁর নাম মুছে যাচ্ছিল। এখন তাঁর নাম আবার উচ্চারিত হতে শুরু হয়েছে, স্বয়ং জিয়া এক সাক্ষাৎকারে মুজিবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নামটি বহাল আছে। সরকারী অফিসাররাও মুজিবের নাম উচ্চারণ করেন তবে কেউ 'মুজিব হত্যা' কথাটা ব্যবহার করেন না, বলেন, 'মুজিবের মৃত্যুর পর…'। তবে মুজিবের ছবি এখন বাংলাদেশে কোথাও দেখা যায় না বিক্রিও হয় না। সর্বত্র একটিই ছবি। সেটি প্রেসিডেনট জিয়ার। মুজিবের ধানমণ্ডীর বাড়িটি এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় সরকারী পাহারায় পড়ে আছে।

মুজিব হত্যা নিয়ে একটি বই বেরিয়েছে 'আমি রাসেল বলছি'। লেখকঃ সৈয়দ আলী নোয়াব। বইটি হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন স্টলে এখন প্রকাশ্যেই বইটি বিক্রি হচ্ছে।

মুজিবের প্রবল শত্রু এখন মেজর জলিলের 'জাসদ'। তারা মুজিবকে 'খুনী' বলে অভিহিত করে। মজার কথা হল—এই জাসদই আবার মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে গঠিত ৯ দলের ফ্রনটের অন্যতম শরিক। আমার ঢাকা থাকার সময়ে ঢাকা বাইতুল মকারমের মাঠে ফ্রনটের যৌথ সভায় বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি ছবি রাখা হয়েছিল বলে জাসদ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট শুরু হয়ে যায়।

ছাত্র ফ্রনটে আওয়ামী লীগ ও জাসদের ছাত্র ফ্রনট বেশ মজবুত।


আধুনিক ঢাকা—একদিকে কোরাণের বাণী— 'যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই'



জনসাধারণের শ্রমে নতুন কাটা খাল

ন্যাপের বিভিন্ন গোষ্ঠী খুব শক্তিশালী না হলেও তাদেরও ছাত্র ফ্রন্ট খুবই জোরদার।

নতুন আবহাওয়া

বাংলাদেশে গত আট/নয় বছরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সুযোগ সুবিধা এসেছে প্রচুর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। সরকারী অফিসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে খুব কম লোককেই পাওয়া যাবে যিনি বহুবার বিদেশে যাননি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের এই যোগ তাদের বিরাট আত্মপ্রত্যয় দিয়েছে। তরুণদের পোশাকেআশাকে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে সাহেবিয়ানা আবার ফিরে এসেছে। ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলগুলি আবার জাঁকিয়ে বসেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও তা আর গভীর ভাবে দাগ কাটেনি। কারও কারও আগের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। ভুল বুঝে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতকে দোষারোপ করার প্রবণতাও কিছু লোকের মধ্যে এখনও অব্যাহত রয়েছে; যদিও তার প্রকাশ সর্বদা সোচ্চার নয়। সেটা অন্তরঙ্গ আলাপের সময় ধরা পড়ে। কিন্তু তার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্কের কোথাও চিড় ধরেনি।

আমাকে একজন বললেন, জীবন সংগ্রামে বাংলাদেশীরা এখন বেশি করে ব্যস্ত, রাজনীতির প্রতি আগ্রহও কমে আসছে। কিন্তু আমারতো তা দেখে মনে হল না। প্রায়ই নিত্য নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হচ্ছে। বাইতুল মকারমের মাঠে বিরোধীদলের সভায় দেখলাম প্রায় হাজার পঞ্চাশেক লোক জড় হয়েছেন। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদমে রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। প্রেসিডেনট জিয়া উপলব্ধি করেছেন—সামরিক শাসনের নাগপাশে বাংলাদেশকে বেঁধে রাখা যাবে না, আয়ুব পারেননি, ইয়াহিয়াও নয়। তাই তিনি সামরিক পোশাক পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই নিজের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

তাঁর বড় সহায় হচ্ছে তাঁর স্বাস্থ্য, কম বয়স (প্রেসিডেনটের বয়েস এখনও ৫০-এর কম) ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

শুনলাম প্রেসিডেনট জিয়া সপ্তাহের অধিকাংশ দিন সকালে উঠে হেলিকপটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কোন জেলার উদ্দেশ্যে। গ্রামে গ্রামে তিনি খাল খননের কর্মসূচী নিয়েছেন।

গ্রামে গিয়ে তিনি হয় খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন, নয়তো জনসভা করেন। এই জনসভায় তাঁর বক্তৃতা বেতার মারফৎ প্রচারিত হয়।

খাল খনন সূচীকে জিয়া খুব মহৎ কারণেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করেছেন। বাংলাদেশে এখনও বছরে ১৮ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। এর একটা প্রধান কারণ সেচের অভাব। ব্যাপক খাল খননের ফলে আশা করা যাচ্ছে আগামী মরশুমে বাংলাদেশের আমন ধানের উৎপাদন দাঁড়াবে ৭৪ লক্ষ টন। গমের উৎপাদনও বাড়ছে। এবারের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ টন। খাল খননের কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে ২০টি জেলাতেই। ৫০০ মাইল দীর্ঘ ১০৩টি খাল খনন হবে। আর এ সমস্তই হচ্ছে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে।

আমরা যেদিন প্রেসিডেনটের সঙ্গে দেখা করতে যাই সেদিনও তিনি জেলা সফরে গিয়েছিলেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরতে কিছুটা দেরি হয়। জিয়া প্রেসিডেনট হাউসের ভেতর থাকেন না, থাকেন অন্যত্র। সেখান থেকে তিনি এখানে আসেন অফিস করতে। লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা এখানেই হয়।

কালো রঙ, নাতিদীর্ঘ চেহারা। কালো পুরু ব্যাকব্রাশ করা চুল মুখের তারুণ্য ঢাকা পড়ে গেছে পাকা গোঁফ ও জুলপিতে। চেহারায় হঠাৎ অকাল প্রৌঢ়ত্বের ছাপ এসেছে। সর্বদা ফুলস্লিভ সাফারী স্যুট পরে থাকেন। পায়ে নিউকাট ধরনের লেসবিহীন জুতো। চোখ দুটি বেশ বড়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। খুব কম কথা বলেন। আচরণে ইমোশান প্রকাশ পায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে হৃদয়ের উত্তাপ ও আলাপচারিতা তাঁর মধ্যে নেই।

মেজাজের দিক থেকে প্রেসিডেনট এখনও মিলিটারিই। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার ছকেই তিনি এখনও জীবনকে চালান। শেখ মুজিবের সময় রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বার ছিল সকলের জন্য অবারিত। তিনি আমলাদের গৃহবিবাদও মেটাতেন এবং মোটামুটি একজন উপজাতীয় সর্দারের ঢঙে রাষ্ট্রশাসন চালাতেন। জিয়া সেই ঘরানার অবসান ঘটিয়েছেন।

আমি যখন ঢাকায় তখন ঢাকার একাধিক সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে জিয়া সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার পরিবর্তন করতে চান। নতুন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন একালের বাংলাদেশের 'পোয়েট লরিয়েট' আল মাহমুদ। কিন্তু আল মাহমুদ এ খবর অস্বীকার করেন। আমি প্রেসিডেনটের কাছে একথাও পেড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, 'আর একটি কাগজে এর প্রতিবাদও বেরিয়েছে। দ্যাট ইজ অল রাবিশ!' কে জানে, কোনটা সত্য! ★

রাজহরার বাঙালীরা বাড়িতেও কথা বলে হিন্দিতে

ইসপাত প্রকল্পের জন্য শিল্প-শহর ভিলাই-এর নাম আজ আর কারো অজানা নেই। ভিলাই ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার পাহাড়ী পথ পেরুলেই রাজহরা। রাজহরায় আছে আয়রন ওর মাইনস। এখান থেকেই হাজার হাজার মানুষ ডিনামাইটে পাহাড় ফাটিয়ে তুলে আনছে টন টন লোহা। বড় না হলেও মোটামুটি ছিমছাম এই শহর। পাথর বাঁধানো রাস্তার ধারে সারি সারি সাজানো টিউব লাইট।

চলুন প্রথমে বাঙালী পাড়া থেকে ঘুরে আসি। রাজহরা শহরের বাঙালী পাড়ার কোন খবরা-খবর পেতে হলে যেতে হবে দে বাবুর চায়ের দোকানে, সন্ধে সাতটার পরে। বাংলা-হিন্দি মেশানো গালগপ্প থেকে শুরু করে চায়ের কাপের রাজনীতি—সবই চলছে। সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, ক্রিকেটের খবর থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, সত্যজিৎ, উত্তম আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হবে পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো মফঃস্বল শহর।

বেশি রাত করবেন না, ন'টার আগেই চলুন বাঙালী অফিসার পাড়ার দিকে, একটা সাইকেল রিকসা ভাড়া নিন, ঘণ্টায় মাত্র পঁচিশ পয়সা তারপর চলে যান সোজা সিটিজেন ক্লাবে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছোট সাহেব বড় সাহেব মেজো সেজো মেম সাহেব সবাইকেই দেখতে পাবেন। সদস্য ছাড়া অন্য কারো এই ক্লাবে প্রবেশ নিষেধ।

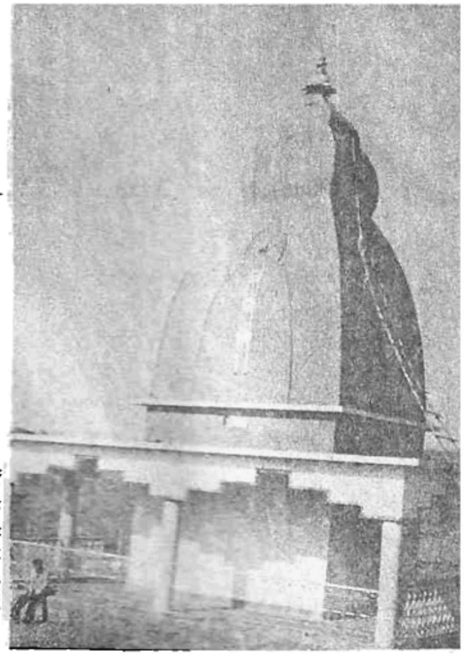
এবার চলুন গান শুনে আসি স্কুলে গিয়ে। না, গানের স্কুল নয়। অবাক হবেন না দিনের বেলায় যেখানে লেখাপড়া শেখানো হয়, রাতে সেখানেই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে স্কুলের সংখ্যা আট-ন'টা, এসব স্কুলের মঞ্চে রামযাত্রা, রাবণ বধ, সোনা বিহান—প্রতি রাত্রে একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। আর একবার যদি কিছু একটা শুরু হয়, চলে রাতভর। গত বছরের একটা পরিসংখ্যান অনুসারে মাত্র এক মাসে এ শহরে একাত্তরটা অনুষ্ঠান হয়। এখানে বাঙালী অনেক, কিন্তু সিনেমাহলে বাংলা ছবি আসে না। এলেও কেউ বাংলা ছবি পছন্দ করে না। '৭৮ জুলাই-এ 'ইনটারভিউ' ছবিটি এখানে আসে, তারপর কোন বাংলা ছবি আসেনি।

এখানকার বাঙালী তরুণেরা অনেকেই বাংলা জানে না। কয়েকদিন আগে এক ফোরম্যানের কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমরা বাংলাটা শেখো না কেন? বাঙালীর ছেলে অথচ বাংলা ভাষা লিখতে পড়তে জানে না—এটা দারুণ লজ্জার। জবাবে জানালো, 'কেয়া জরুরত? হিন্দি হমারে রাষ্ট্র ভাষা, হিন্দি মে কাম চলা লেঙ্গে। আউর বংগাল মে তো জায়েংগে নেহী, চিটঠি-ইটঠি সভী অংগরেজি হিন্দি মে চলে গা।' বাঙালী বাড়িতেও নিজেদের ঘরোয়া কথাবার্তায় বাংলার আগে হিন্দি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। বিশেষ করে এখানকার স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের থেকে শুরু করে বাচ্চাদের

গাজী এম আনসার

মধ্যে। বাইরে থেকে চেনা মুশকিল বাঙালী বলে। রাজহরা হসপিটল সেকটরের চারজ-ম্যান দস্তিদারবাবুর ছোট ছেলে সুমিতকে যদি জিজ্ঞেস করেন, সুমিত তোমার বাবা, মা অথবা কাকু বাড়ি আছে কি? সংগে সংগেই একদম সঠিক উচ্চারণে জবাব মিলবে, 'পতা নেহী, পিতাজী সুবহ সে কঁহী চলে গয়ে।' সুমিতের বয়স মাত্র ছয় কি সাত।

খাবার-দাবারের ব্যাপারেও ঠিক তাই, দোকানে গেলে আপনাকে দোসা, ইডলি, উপম খেয়েই ঢেঁকুর তুলতে হবে। বাঙালী রান্না বাঙালী খাবার-দাবার তৈরি করবে কে? যদিও হোটেল মালিক দু-চারজন বাঙালী



রাজহরার কালী মন্দির

আছেন। ওসব বাঙালী গন্ধের খাবার আজকাল ব্যাক-ডেটেড. আপ টু ডেট খাবার না হলে আপনার দোকানে বিক্রি হবে না। বাঙালী পাড়া হসপিটাল সেকটরে এক বাঙালী ভদ্রলোক একটা হোটেল খুলেছিলেন বাঙালী হোটেল। তিন মাসের মধ্যে হোটেলের দরজায় তালা। বাঙালী হোটেলের সাইন-বোরডটা এখনো জ্বলজ্বল করছে।

পোশাক-আশাকে এখানকার বাঙালীরা কতদূর বাঙালী? এখানে কোন বাঙালী কুমারী মেয়েকে স্কুল বা কলেজে শাড়ি পরে যেতে দেখিনি, স্কারট ব্লাউজ, সালোয়ার পানজাবী, মিডি, ম্যাক্সি, অথবা ফুলপ্যানট, বুশ, টি শারট ইত্যাদি। অবশ্য মাঝে মধ্যে পুজোর সময় শখ করে এক-আধ ঘণ্টা শাড়ি যে এরা পরেই না এমন নয়। তবে চলতি ধারাটি হল শাড়ি বর্জন। তরুণ-তরুণীদের কথা বাদ দিন। এখানকার মাঝবয়সী ভদ্র-লোকরা কি ধুতি পানজাবী পরেন? না। শহরে মাত্র একজনই বাঙালী ভদ্রলোক আছেন যিনি কেবল ধুতি পানজাবীই পরেন। ভদ্রলোক রাজহরা শহরের সংগীতের শিক্ষক মুখার্জিবাবু।

বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে রবীন্দ্র গ্রন্থাগার, দুর্গামণ্ডপ, কালীমন্দির। রবীন্দ্র গ্রন্থাগার দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় লাইব্রেরি, ক্লাব আর দোতলায় মাঝে মধ্যে নাচ, গান, নাটকের রিহারসাল ইত্যাদি হয়ে থাকে। হয় ইনডোর গেমসও—দাবা, ক্যারাম, লুডো, তাস, ব্যাডমিনটন সবই। লাইব্রেরিতে নতুন বাংলা বই, পত্রপত্রিকা বলতে গেলে নেই-ই। লাইব্রেরিয়ান ভক্তিবাবুকে জিগ্যেস করতেই ওর সাফসুতরো জবাবঃ সেসব পড়ার লোক কোথায় এ শহরে? আর পড়বে যে সে সময়ই বা কোথায় বাঙালীবাবুদের?

সকালে উঠেই ডিউটি, সাহেবকে খুশি

করে ওভারটাইম। তারপর বিকেলে আছে মারকেটিং অথবা 'পিকচার'। চালের দাম পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা হলেও তাতে মাথা ব্যথা নেই। কেনই বা থাকবে? ভিলাই স্টিলে চাকরি করা মানেই স্বর্গের অর্ধেক কবজা করে রাখা।

এখানকার বাঙালী যুবকরা কি রাজনীতি সচেতন? মোটেই না। চায়ের দোকানের আলোচনায় রাজনীতি প্রসঙ্গ কখনো-সখনো উঠলেও তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। স্মার্ট শিক্ষিত এক তরুণের প্রশ্নে তো অতি কষ্টে হাসি চেপে ছিলাম: সি পি আই আউর সি পি এম দোনো কো ঝানডা লাল কিঁউ?

এখানকার স্কুল-কলেজে ছাত্র রাজনীতিও নেই। ছাত্ররা ব্যস্ত থাকে পুতুল নাচ, সারকাস আর চলো ইয়ার 'বড়ীয়া পিকচর' এসব নিয়ে। বড় জোর বিকেলে দল বেঁধে চলে সপ্তগিরি পারকে আড্ডা আর মেয়ে দেখলে 'ও মেরী জান তেরী আঁখু মে জাদু কিয়া···' গান।

ছাত্র আন্দোলন বলে কিছু নেই বললে ভুল হবে। এই তো গত বছর রাজহরা শহরের ছাত্ররা আন্দোলনে মেতে ছিলো। কোন স্কুলের হেডমাসটার ছাত্রদের চুল কাটতে বলেছিলেন তাই ছাত্র আন্দোলন। 'মর জায়েঙ্গে মিট জায়েঙ্গে, বাল নেহী কটওয়াঙ্গে।'

অ আ ক খ নয়, বাঙালী শিশুরা প্রথম পাঠ শুরু করে এ বি সি ডি দিয়ে। এ শহরে বাঙালী অফিসার থেকে শুরু করে কেরানী-বাবুরা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পাঠান কনভেনটে। বাংলা নাই বা জানলো, ক্ষতি কি?

সংগীতের চর্চা এখানকার প্রতিটি বাঙালী ঘরেই। রবীন্দ্রসংগীত? না, তা এখানে অচল। বাংলা গানের কদর নেই এখানে। তাই বাঙালী মেয়েরা 'আলো আমার আলো' 'মম চিত্তে' এরকম দুটো-একটা 'টেগোর সং' শিখেই শিখতে শুরু করে 'তেরি বিনধিয়া' অথবা 'ম্যায় ভি গয়া, মেরে দিল ভি গয়া।'

রাজহরা শহরের বাঙালীদের তাহলে কি বাঙালী বলে একেবারেই চেনা যায় না? না, নিরাশ হবেন না, আশার আলো দেখতে পাবেন একটি জায়গায়। সন্ধ্যার মাছের বাজারে। কানে আসবে মধুর বাংলা ভাষা: রুই মাছটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে, নিয়ে নিন ঘোষদা, আমিও নিলাম কেজিখানেক।

★

বোমবাইয়ের বাঙালীরা

বোমবাই।

আরব সাগরের তীরে ভারতের এই প্রমোদ নগরীর আকাশে-বাতাসে সাতসমুদ্র পারের সভ্যতার ছোঁয়া। মেরিনড্রাইভ আর জুহুর ধুলোয় তরল সোনার গন্ধ, পেট্রোডলারের গুঁড়ো। অবস্থান, সীমানা আর ভূগোলে একান্ত স্বদেশের এই শহরটি ভাবে ভাষায় আর দিন যাপনের ভঙ্গিতে অনেকখানিই বিদেশের। বহুযুগ ধরে বহু মানুষের ধারা এসে মিলেছে আরবসাগর ধোয়া মহারাষ্ট্রের এই কসমোপলিটান শহরে। সেই স্রোতে সামিল হয়েছে বাঙালীরাও।

প্রায় এক লক্ষ বাঙালী এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন শহর বোমবাই এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকা জুড়ে। একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত স্বর্ণকার। শুনলে আনন্দ হয় যে, বোমবাই শহরের ৯৯ জন হীরে সেটিং-এর কারিগরই বাঙালী। গয়নার যাবতীয় সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান অলঙ্করণের কাজই বাঙালীরা করেন। বোমবাইতে গয়নার আড়ৎ জাভেরী বাজার দিয়ে হাঁটার সময় মাঝে মাঝেই ঘরোয়া বাংলা কানে আসে। এই অলঙ্কার শিল্পীরা এক শতাব্দীর ওপর এখানে থেকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে জিইয়ে রেখেছেন।

বোমবাই শহরে প্রায় দু'শ ঘর স্বর্ণকার রয়েছেন। জনসংখ্যায় এরা প্রায় দশ হাজার। এরা মনেপ্রাণে বাঙালী এবং বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, শিল্পীরা কেউই দোকান সাজিয়ে বসেনি। এরা ফুরনের অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে থাকেন। ফলে গ্রাহকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ কমই হয়। অর্থনৈতিক কারণে হীরের কাজের বাজার আগের তুলনায় মন্দা। তাই বংশপরম্পরায় বাঙালী হীরের কারিগররা তাদের উত্তর-পুরুষদের অন্য কোন জীবিকায় নিযুক্ত করার কথা ভাবছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সামরিক বাহিনীতে চাকরি নিয়ে কিছু বাঙালী বোমবাই এলেন, তারা কর্মস্থানের কাছাকাছি প্যারেলকে বেছে নিলেন বাসস্থান হিসাবে। ১৯২২ সালে তাদের চেষ্টায় গড়ে উঠল 'বেঙ্গল ক্লাব'। দিনে দিনে সেই ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি পেতে লাগল, শিবাজী পারকে স্থায়ী ক্লাব হলো। বোমবাইয়ের বিখ্যাত শিবাজী পারকের দুর্গা-পুজো এরাই করে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শ'খানেক বাঙালী কার্যোপলক্ষে বোমবাই-

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

এর অম্বরনাথ অঞ্চলে এলেন। বাঙালী সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্যে এরা গড়লেন 'বাঙালী সঙ্ঘ'।

স্বর্ণ-শিল্পীদের মত আর এক শিল্পীর দারুণ কদর বোমবাই শহরে। এরা হচ্ছে মিষ্টান্ন শিল্পী। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কয়েকজন বাঙালী শিল্পী মিষ্টি তৈরি করা শুরু করেন। রসনা তৃপ্তিকারী বাঙালী মিষ্টি—রসগোল্লা, সন্দেশের সম্মোহক স্বাদ স্থানীয় বাসিন্দাদের জিভে লেগে যায়। দিনে দিনে বাড়তে থাকে তার পসার। পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টির দোকানে সাইনবোরড জলজ্বল করতে থাকে 'বাঙালী মিঠাইয়া'। বোমবাই শহরে বাঙালী মিষ্টির এত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাঙালীরা কোন স্থায়ী মিষ্টির দোকান করতে পারেননি। বাঙালী পরিচালিত কিছু কিছু মিষ্টি তৈরির কারখানা আছে যারা বাড়ি বাড়ি মিষ্টি যোগান দেন।

বোমবাইয়ের চলচ্চিত্রের রুপোলী দুনিয়ায় বাঙালীর আধিপত্য তো উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরেই বোমবাইয়ের বাঙালী আজ তার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করেছে। তাই সরকারি বেসরকারি সব রকম প্রতিষ্ঠানেই দেখা মেলে তাদের—নিচুতলার কর্মী থেকে সংস্থার পরিচালনার শীর্ষে পর্যন্ত। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানাও তাদের করায়ত্ত।

বাঙালীর সঙ্গেই বোমবাইতে এসেছে বাঙালীর '১২ মাসে ১৩ পার্বণের' সংস্কৃতি—দোল-দুর্গোৎসব-কালীপুজো। বোমবাইয়ানার তোড়েও তার স্বাতন্ত্র্য এতটুকু মলিন হয়নি। বান্দ্রার বিবেকানন্দ ক্লাব, গোরেগাঁওয়ের কল্লোল ক্লাব কিংবা মধ্য বোমবাইয়ের দুর্গাবাড়ি সমিতির মত অসংখ্য সংস্থা এই সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

নববর্ষের প্রথম দিনটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে বৎসরের যাত্রা শুরু হয়। তারপর পালিত হয় ২৫শে বৈশাখ, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি।

বোমবাইয়ের পুজোয় একটা আলাদা আমেজ। ভোর থেকে মেয়েরা পুজোমণ্ডপে এসে শুদ্ধাচারে পুজোর আয়োজন করেন। পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে, নির্দিষ্ট সময় পুজো, অঞ্জলি ইত্যাদি হয়। তারপর প্রসাদ বিতরণ। দ্বিপ্রহরে ভোগের ব্যবস্থাতেও কোন ত্রুটি নেই। আহুত, অনাহুত সকলকে আত্মীয়ের আদরে ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সন্ধ্যায় বসে গান-বাজনার আসর।

পশ্চিমের শিকড়বিহীন সভ্যতার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে বোমবাইয়ের জীবনযাত্রায়। যে ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রতি মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে জীবন দর্শনের মূল্যবোধ। তারই মধ্যে গভীর মমতায় বোমবাইয়ের প্রবাসী বাঙালীরা অদ্ভুতভাবে আঁকড়ে রেখেছে এক চিরন্তন মূল্যবোধকে—বুকের গভীরে তির তির করে বয়ে চলা সেই ফল্গু ধারাটির নাম বাঙালীয়ানা। বাংলার সংস্কৃতি। ★

পথ চলতি

সমানে সমানে

এস এন ব্যানারজি রোড আর রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের সঙ্গম। এক সময় ওখানে এসে দাঁড়ালো পাগলা মেহের আলি। মুখে তার 'সব ঝুটা হায়' সংলাপ নেই। দাড়ি আছে, গায়ে ছেঁড়া জোব্বা, হাতে একটা দেশলাই। সে চ্যাচাচ্ছিল : আমি আগুন লাগিয়ে কলকাতা পোড়াব—এ্যাই পোড়ালুম। আর সেই সঙ্গে একটা একটা করে জ্বালাচ্ছিল দেশলাই কাঠি।



পাশের খালাসিটোলার কানট্রি লিকার বার থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা এক রঙিন মানুষ। অবিন্যস্ত চুল, চালেও টাল। খোলা পানজাবি নিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে রোমশ বুকের মাসল। মুখে চোখে আঁতেলিয় আভাস। থমকে দাঁড়িয়ে মেহের আলির দিকে তাকিয়ে একবার জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন : এই সেরেছে। তারপর টালমাটাল দৌড়ে মেহের আলির কব্জি ধরলেন—খপ। বললেন : এ্যাই মা-ই-রি কি করছিস ; তোর আক্কেল নেই—কত নারী শিশু পুড়ে ছাই হবে জানিস ? আর নারীরা পুড়ে গেলে কলকাতায় লোক জন্মাবে কি করে ?

সৌরেন মিত্র

বাচ্চা নিয়েই

এসপ্ল্যানেডের এক বে-সরকারী অফিসে চাকরির ইনটারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। গোটা দশেক আসন, প্রার্থী শ'পাঁচেক। চোখে পড়ল অপেক্ষমান প্রার্থীদের পাশে বসে একটি বাচ্চা কতকগুলো খেলনা নিয়ে খেলা করছে। পাশে ২৫/২৬ বছরের এক যুবক।

কৌতূহল হল। পায়ে পায়ে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাচ্চাটি কে ?' যুবক মৃদু হেসে বললেন, 'আমার ছেলে।' অবাক না হয়ে পারলাম না। বললাম, 'তা বাচ্চাকে নিয়ে ইনটারভিউ দিতে এসেছেন কেন ?' যুবক বললেন, 'আমি কি আর নিয়ে এসেছি ? এনেছেন আমার স্ত্রী। তিনিও এসেছেন ইনটারভিউ দিতে। আগেই তার ডাক পড়েছে, তাই তিনি ভেতরে গেছেন। আমার ডাক পড়লে আমি যাব।'

ইতিমধ্যে ২০/২২ বছরের এক বিবাহিতা তরুণী এসে হাজির। যুবক বললেন, 'ইনিই আমার স্ত্রী। আমরা সব জায়গাতে একসঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত করি। একসঙ্গে, একই কলেজে দু'জনে পড়াশোনা করেছি। একসঙ্গেই দু'জনে পাশ করেছি। বিয়ে করেছি বছর তিনেক আগে। দু'জনের এক জনেরও অন্তত একটা চাকরি ভীষণ দরকার।'

সামসুল হক

কান্নার আলো

শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে ট্রামবাস মোটর গাড়ির জটলা—লাল আলোর নিষেধে থমকে দাঁড়িয়েছে সব। ১২ নম্বর ট্রামের পাশেই ছিমছাম সুদর্শন ফিয়াট একখানা। ট্রামের ভেতর আমার পাশের সিটে ঠিক জানলার কাছে একজন ২৪ বছরের সুদর্শন তরুণ, কিছুটা ক্লান্ত ও উদাস চোখের ওপর উড়ে আসা চুলগুলো মাঝে মাঝে আলতো করে পেছন দিকে সরিয়ে দিচ্ছিল। একটু যেন বিরক্তও—জ্যামের দরুনই নিঃসন্দেহে।

আমিও অন্যমনস্ক ছিলাম। পাশের যুবকটির মধ্যে কিঞ্চিত চঞ্চলতা অনুভব করে সচেতন হলাম। তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই নজরে পড়ল ফিয়াটের কোলের ভেতর মিষ্টি হাসিমাখা একটা মুখ। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। আমিও চোখ সরালাম। কিন্তু মেয়েলি গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক পেয়ে বসেছে আমাকে। সন্তর্পণে লক্ষ্য রেখেছি ওদের দু'জনের ওপর। ছেলেটির চোখে মুখে তখন আর ক্লান্তি ও বিরক্তির এতটুকু ছাপ নেই, বুকের খুশি মুখের হাসি হয়ে ফুটেছে।

তারপর হঠাৎই সেই করুণ মুহূর্তটি—জ্বলে উঠল সবুজ আলো। ট্রাফিক পুলিশের হাতের ইঙ্গিতে চলতে শুরু করল ট্রাম, নিমেষে ট্রামকে পেছনে ফেলে ছুটে চলে গেল ফিয়াট। ছেলেটির মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসি। তবে এবার আর বিরক্তি নয়, কিসের যেন কষ্ট ফুটে উঠতে দেখলাম তার চোখে মুখে।

পান্নালাল ঘোষ

শ্যামলের বাড়ি

দোতলা বাসটায় অল্পই ভিড়। তবু যুবকটি ঝুলছে গেটে। কনডাকটর ছিলেন দোতলায় ; টিকিট কাটতে ব্যস্ত। হুড়মুড় করে নেমে এলেন একসময়। ব্যস্ত গলায় বললেন—দেখি দাদা টিকিট ?

যুবকটি খুব নিরাসক্ত ভঙ্গীতে ৫০ পয়সা বের করে কনডাকটরের হাতে দিয়ে বলল—একটা পঁচিশ দিন।

কনডাকটরের পছন্দ হলো না ভঙ্গী। বললেন—কতদূর যাবেন ?

—আপনি একটা ২৫ দিন। যুবকটির সেই একই ভঙ্গী।

—আঃ, কোথায় যাবেন বলবেন তো ?

এবার সরাসরি চোখের দিকে তাকায় যুবক। বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কোথায় যাব বললে, আপনি চিনবেন ?



—এ লাইনে এতদিন আছি, চিনবো না কেন ? হেসে ফেলে কনডাকটর বললেন।

—আমি শ্যামলের বাড়ি যাব। আপনি চেনেন ওর বাড়ি ?

এবারে কনডাকটর বোকা, হাসি যুবকের মুখে।

ভাস্কর চৌধুরী

ব্যঙ্গচিত্র ঃ [illegible]

জ্যোতি বসুর পর কে ?

ধরা যাক—ছ'মাস, এক বছর বা দু' বছর পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হল। সে নির্বাচনে যদি কংগ্রেস (আই) দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পায়, তাহলে বলুন তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন ? না, জবাবটা চট করে দিয়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার কারণ ও দলে এমন কোন স্বতো-ভাস্বর ব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে নেই যাকে দল বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নির্দ্বিধায় মুখ্যমন্ত্রী পদে বরণ করে নিতে পারে। কিন্তু নির্বাচনে সি, পি এম দলই যদি আবার গরিষ্ঠতা পেয়ে ফিরে আসে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন ? এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের একটি বালকও বলে দেবে : সি পি এম জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন জ্যোতি বসু, আবার কে ?

এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে সি পি এম নির্বাচনে জিতলে জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা বলা চলে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। উনি আর কতদিন—এ প্রশ্নও দলে কেউই তুলবে না। বস্তুতপক্ষে জ্যোতি বসুর পর কে, বা জ্যোতিবাবুর বিকল্প কে—এ প্রশ্ন নিয়ে ওঁর পারটি ক্যাডাররাও মোটেই বিব্রত নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে পারটির আদর্শ অনুসারে সময়োপযোগী নেতার সন্ধান ঠিকই মিলবে—এটাই তাদের বিশ্বাস। অনেকে হয়ত ভুরু কুঁচকে বলবেন : কমিউনিসট পারটিতে নেতা কলের পুতুল নয় যে ভালো জাতের ইসপাত দিয়ে যাতে তার বডি তৈরি করা যায় সেজন্য আগে থেকে কারখানায় অরডার দেব ! 'গণ সংগ্রামের' মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে থেকেই নেতা বেরিয়ে আসবেন।

কথাটা ঠিক। জনগণের মধ্যে অবিসংবাদী না হতে পারলে নেতা কিসের ?

জ্যোতি বসু কি সেই অবিসংবাদী নেতা ? এক অর্থে বলা চলে : হ্যাঁ। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি জ্যোতি বসুর পদত্যাগ করা উচিত ?—এই প্রশ্নের উত্তরে ৭২ শতাংশ মানুষ চিৎকার করে বলবেন : না, না, কোন মতেই উচিত নয়। ২০ শতাংশ বলবেন : পদত্যাগ করা উচিত আর ৮ শতাংশ মুখ বুজে থাকবেন। যদি প্রশ্ন ওঠে—পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের জন্য দায়ী কি জ্যোতি বসু ? তাহলেও ৫২ শতাংশ মানুষ আপত্তি করবেন ; সায় দেবেন ৪৩ শতাংশ, আর ৫ শতাংশ কোন কথা বলবেন না। (আনন্দ-বাজার পত্রিকার একটি সমীক্ষা)।

বছর বছরও যদি জ্যোতি বসুর নামে ভোটগ্রহণ হয়, তবে তাঁর অভিধানে 'পরাজয়'



শব্দটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এদিক থেকে জ্যোতিবাবু অবিসংবাদী নেতা তো বটেই।

জ্যোতিবাবু শতায়ু হোন, দীর্ঘজীবী হোন—এটা সকলেই, এমন কি তার কঠোর সমালোচকও চাইবেন ! অনেকেই শতায়ু হতে পারি, কিন্তু কেউই চিরায়ু নই। তাই যদি বলি—জ্যোতি বসু অবিনশ্বর, তবে তিনি

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

নিজেই ঠিক একদিন তার শত্রুতা করে বসবেন।

তাই জ্যোতি বসুর পরেও আরেক জ্যোতি বসুর সন্ধানের প্রশ্ন ওঠে। সেই সন্ধানের আগে একটা কথা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, জ্যোতিবাবু রাজ্যের কর্ণধার হিসেবে তাঁর কাজ ও চালচলনের মধ্যে যৌবনের যে দীপ্তিটি সর্বক্ষণের জন্য ফুটিয়ে তোলেন, তাতে তাঁর বিকল্পের অনুসন্ধান বিলাসিতা বলেই মনে হতে পারে।

কত বয়স হল জ্যোতিবাবুর ? এ বছরের ৮ জুলাই তাঁর ৬৬ বছর পূর্ণ হল। অনেকেই বলবেন—রাজনীতিতে এটা আবার একটা বয়স নাকি ? প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই মোরারজী দেশাইয়ের বয়স ছিল আটের ঘরে। চরণ সিং-ও প্রায় তাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বামফ্রন্ট সরকারের কট্টর বিরোধী প্রফুল্লচন্দ্র সেনও তো অশীতিপর। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ন'টায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন স্বাধীন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন তখনই তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। সেই থেকে ১৯৬২ সালের পয়লা জুলাই বেলা ১২টা পর্যন্ত একটানা সাড়ে চোদ্দ বছর তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে গেছেন ! স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশকে পুনর্গঠনের যুগে বয়স্ক ডাঃ রায় যদি শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেন, তবে জ্যোতিবাবুর যে এখন নেহাৎই যৌবন, একথা কে অস্বীকার করবে ?

তবু প্রশ্ন ওঠে। সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন নেতা আসবেন—একথা জ্যোতি বসুর দল সি পি আই (এম) নীতিগত ভাবে মেনে নিলেও, আগামী দিনে পারটির জ্যোতির্ময় শিখাটিকে ধরে রাখতে পারবেন কে—এ ব্যাপারে দলের কর্মী ও নেতারা কি কখনই ভাবেন' ঘরে চুরি করে বসেন না ? তাদেরও মনে মাঝে মধ্যে এই ভাবনা যে উঁকি দেয় না এমন তো নয়।

গত বছরেও কলকাতায় দলের রাজ্য সম্মেলনের সময় সি পি এম-এর একজন পলিটব্যুরো সদস্যের মুখ থেকেও একটি বিকল্প নাম শোনা যায়। দলের বিশ্বস্ত একাধিক কর্মীকেও জনান্তিকে এই নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। একথা অবশ্য ঠিক নয় যে পরবর্তী জ্যোতি বসুর ভাবনায় সি পি এম-এর চান-খাওয়া বন্ধ। তবে আদর্শ একটা দলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে, কিন্তু দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে নেতৃত্ব—একথা সি পি এম-এর পক্ষেও উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল।

আসলে এত কথার দরকার হত না যদি জ্যোতিবাবু দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এত জনপ্রিয় ও বিতর্কিত না হয়ে উঠতেন !

কি এমন গুণাবলী জ্যোতিবাবুর মধ্যে আছে যা অন্যান্য নেতাদের মধ্যে বিরল।

এক : সৌম্যকান্তি। মানে সুঠাম দেহে 'কদম্ব রেণু মাখি বৃক্ষতলে বেণু বাজানো' চেহারা নয়। চোখে মুখে তেজের দীপ্তি, শাণিত ধারালো দৃষ্টি, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হাঁটা—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

দুই : ওঁর সাধারণ ভাষা দিয়েই উনি অসাধারণ ভাবে সভা-সমাবেশের শেষ সারির মানুষটিরও হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করতে পারেন।

জ্যোতিবাবু বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হবার দিন কয়েক পরেই (২৩ সেপটেমবর '৭৭) তৎকালীন রসায়নমন্ত্রী বহুগুণা এলেন হলদিয়ায়। উদ্দেশ্য পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেকস-এর অনুকূল পরিবেশ খতিয়ে দেখা। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের বৈঠক বসল। বৈঠকে জ্যোতি বসু, বহুগুণা, আভা মাইতি, জ্যোতির্ময় বসু, কানাই ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীরও দাবি ছিল হলদিয়ায় পেট্রো-

কেমিক্যাল কারখানা গড়ে তুলতে হবে। সেদিন বৈঠকের উপস্থিত নেতাদের চারিদিকে সাংবাদিকরাও হাজির ছিলেন। জ্যোতিবাবু যতই যুক্তি দিয়ে এই কারখানা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন, বহুগুণা ততই সেই মুহূর্তে কমিটমেনট থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। এক সময়ে বহুগুণা বলে উঠলেন : এই বৈঠকে সাংবাদিকরা কেন? মুখ্যমন্ত্রী বললেন : কেন, এখানে কারচুপির কি ব্যাপার আছে? পরে তো সাংবাদিকদের আমার এই কথাই খুলে বলতে হবে, সুতরাং তারা থাকলে দোষটা কিসে? ওরা নিজের কানেই শুনুক, আপনারা এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কী বলতে চান। বহুগুণা আর কোন জবাব দিতে পারেননি।

কোনরকম প্রতিশ্রুতি ছাড়াই বহুগুণা তখন বৈঠক শেষ করলেন। জ্যোতিবাবু বেরিয়ে আসছেন। ইনডিয়ান অয়েল অফিসের ফটকের সামনে স্থানীয় জনসাধারণ দাবি



তুললেন : আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনতে চাই। বৈঠকে যা ঘটল, মুখ্যমন্ত্রী হুবহু তাই সরল বাংলায় তাদের সামনে বলে গেলেন। কোন রকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, কোনরকম আতিশয্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী বললেন : আমরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি। যখন যেমন ঘটবে আপনাদের কাছে খুলে বলব। আপনারা আমাদের যেমন বলে দেবেন তেমন ভাবেই আমরা চলব।

‘মহাকরণে বসে আমরা সরকার পরিচালনা করব না’, ‘আমরা জনগণের সঙ্গে যোগ রেখে চলব’, ‘সারা দেশের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরিচালনার দিকে তাকিয়ে আছেন,’ —জ্যোতিবাবুর এই বক্তব্য এবং তার পুনঃপ্রয়োগ জনসাধারণের মধ্যে কখনই বিরক্তি উৎপাদন করেনি, করছেও না। তাছাড়া রাজনৈতিক তত্ত্বে তাঁর ভাষণ কখনই ভারাক্রান্ত হয় না।

তিন : কমিউনিসট নেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি।

চার : দলবদলের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত।

পাঁচ : ব্যক্তিগতভাবে তথাকথিত দুর্নীতির উর্ধ্বে।

ছয় : কাজে দ্রুতগতি। সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগতভাবে যা করণীয় তা তিনি ফেলে রাখার পক্ষপাতী নন। অনেক মন্ত্রীর টেবিলেই অনুমোদন সাপেক্ষ ফাইলের স্তূপ জমে থাকে কিন্তু জ্যোতিবাবু তার থেকে অনেকটাই মুক্ত।

সাত : ত্রুটি এবং অক্ষমতাকে স্বীকার করার সততা। এই গুণটি নিয়ে অবশ্যই দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রী সুবাদে তাঁকে এমন অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় যেখানে তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার আছে, এমন কথা বলা যায় না। যেমন চলচ্চিত্র বা নাটকের বিষয়ে যদি একটি সেমিনার হয়, তবে সেখানে জ্যোতিবাবুর সরকারী নীতির চর্বিত চর্বণ ছাড়া খুব একটা কিছু দেবার থাকে না। কিন্তু ভাষণের শুরুতেই তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেন।

আট : জেদ এবং জেহাদ : জ্যোতিবাবুর জেদ বলতে যা বোঝায়, তাকে কেউ কেউ একগুঁয়েমিও বলতে পারেন।

যেমন বিদ্যুৎ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পৃথক বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দাবি বিভিন্ন মহলেই উঠেছে। পৃথক দপ্তরের মন্ত্রী হলে বিদ্যুৎ সমস্যার কতটা সমাধান হত সে ব্যাপারে তর্কের অবকাশ থাকলেও, জ্যোতিবাবু এই দাবি মানতে একেবারেই সম্মত নন। তার মানে এই নয় যে, ক্ষমতার মোহেই বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ রয়েছে। যতক্ষণ দাবি সোচ্চার, ততক্ষণ তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। এটাকে সহজে পরাজয় বরণ না করার মানসিকতাও বলা যায়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে চ্যালেনজ জানানোর কোন অভিনবত্ব নেই। এটা রুটিন-মাফিক ব্যাপার। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের জেহাদে জ্যোতিবাবুর চরিত্রের আকর্ষণীয়তা লক্ষ্য করবার মত। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রনট আমলেও তিনি এ নিয়ে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, পানজাব সরকারকেও সেদিন তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং-ই ছিলেন তখন পানজাবের অকালী মুখ্যমন্ত্রী। পরে জনতা সরকারের আমলে জ্যোতিবাবুর এই জেহাদের সামিল হয় সাত-আটটি রাজ্য। আজও তাঁকে কেউই উড়িয়ে দিতে পারেননি : বিতর্কেরও অবসান হয়নি। হতে পারে এটা জ্যোতিবাবুর দলের নীতি, অথবা ফ্রনটের নীতি, কিন্তু তাকে রাজ্যের সমস্যার সঙ্গে একত্রিত করা তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বেই সম্ভব হয়েছে।

নয় : বাকচাতুর্য ও উইট : দলীয় নীতি, সরকারী নীতি ও তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি কোন সমস্যা সম্পর্কে জবাব দিতে পারদর্শী। সাম্প্রতিক এক দিল্লি সফরের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। রাজ্য কংগ্রেস (আই) সভাপতি অজিত পাঁজা অভিযোগ করেন—প্রধানমন্ত্রী ডাকেননি, জ্যোতিবাবু যেচেই তার সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী কিভাবে কার মাধ্যমে তাঁকে ডেকেছিলেন তার বর্ণনা দেন এবং বলেন : অজিত পাঁজা মশাই কংগ্রেস (আই) করেন বলেই কি তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে হবে? মন্তব্যের ঠাস বুনুনিটা লক্ষ্য করবার মতো। একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি একদিন জ্যোতিবাবুর কাছে বিদ্যুৎ-এর ওপর একটা একসক্লুসিভ ইনটারভিউ চাইলেন। তিনি বলেন : বিদ্যুৎ নেই, তা বলব কি নিয়ে? এখানে ত্রুটি স্বীকারে উইট এবং ব্যক্তিত্বের মেজাজ চমৎকার মিলে গেছে।

দশ : জাতীয় নেতার সম্মান : দল থেকেও তিনি এই সম্মানটি পেয়ে থাকেন। বিধানসভা বা লোকসভা যে কোন নির্বাচন বা ভিন রাজ্যের যে কোন সমস্যাই হোক না কেন, সেখানেও জ্যোতিবাবুর ডাক পড়ে। উড়িষ্যা বা পানজাব গিয়ে ভাষণ দিলেই যে তিনি সেই রাজ্যের ভাষা বলতে পারেন তা নয়। এ থেকে বোঝা যায় সব রাজ্যের মানুষের মধ্যেই তাঁর একটা সহজ আবেদন আছে।

এগারো : সাহস : ১৯৭৮ সালের ১২ এপ্রিল। বরকত সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি মিছিল বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবিতে মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সিঁড়ি বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুলিশের বাধা তিনি সেদিন শোনেননি। পরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, পুলিশ যেখানে তাদের রুখতে পারছে না, দরকার হলে আমাকেই নেমে যেতে হবে।

১৯৬৯ সাল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা। একটি ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক পুলিশ কর্মী নিহত হন। পুলিশ বাহিনী ঐ পুলিশের মৃতদেহ নিয়ে মহাকরণ অভিমুখে না গিয়ে বিধানসভায় ঢুকে পড়ে। সারা বিধানসভায় তখন তুলকালাম কাণ্ড। উত্তেজিত পুলিশবাহিনী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। জ্যোতিবাবু রুখে

দাঁড়ান। তাঁর সামনে বিক্ষোভকারীরা দমে যায়। তিনি পুলিশদের সঙ্গে নিয়েই ঘর থেকে বেরোন। তাদের তাণ্ডবের চেহারা ঘুরিয়ে দেখান এবং অবশেষে অধ্যক্ষ বিজয় ব্যানারজির ঘরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করান। কারণ বিধানসভায় অধ্যক্ষই সর্বেসর্বা। সেদিন বিভিন্ন সংবাদপত্র জ্যোতিবাবুর এই সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

জ্যোতিবাবুর মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটেছে, তাই বলে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের কর্ণধার হিসাবে তিনি একেবারে পূর্ণ-শক্তির অধিকারী—এমন কথা বলা যায় না। যেমন জ্যোতিবাবু সরকারী কর্মীদের (এমনকি, কো-অর্ডিনেশন কমিটিভুক্ত) নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসতে বললেই যে তারা সুবোধ বালকের মতো চলে আসবেন, তা কিন্তু নয়। 'সিটু'-র বিদ্যুৎ কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়েও জ্যোতিবাবু নিজের দলের লোকদের কাজ না করার সমালোচনা করার মতো সাহস রাখেন, কিন্তু ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ পর্ষদে প্রশাসন নেই বলে যে মন্তব্য করে ফেলেন, তাতে তাঁর নিজেরও সম্মান বাড়ে না, পর্ষদ কর্মীদের শ্রদ্ধাও তাঁর ওপর থেকে অনেকটাই কমে আসে।

তাছাড়া সরকার ও দল—দুটিকে একসঙ্গে সামাল দিতে গিয়েও তিনি অনেক সময় নিজেকে ছোট করে ফেলেন। অবশ্য দলের নীতি ও সংগঠনের চাপই তাঁকে একাজ করতে বাধ্য করে। যেমন, আসাম পরিস্থিতির প্রতিবাদে যখন পশ্চিমবঙ্গে বনধ ডাকা হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও জ্যোতিবাবু দলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সোচ্চার সমর্থনের কথা বলেন; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকেই আবার বলতে হয় 'এই বনধে রাজ্য প্রশাসন কোন বাধার সৃষ্টি করবে না।' যেমন খেলার মাঠে উচ্ছৃংখল ঘটনা ঘটলে জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার নিন্দা করেন ও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন, আবার সেখানেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁর দল যে প্রচারাভিযানে নামছে সেকথাও সংগঠন কর্মীদের জন্য অবশিষ্ট না রেখে নিজেই ঘোষণা করে ফেলেন। এর ফলে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে জ্যোতিবাবুর কথা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।—বিপ্লব করে ক্ষমতায় এলে হয়তো পারটি ও সরকারকে অভিন্ন করে দেখা সম্ভব। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করব অথচ 'বেণী ভেজাব না'—এটা বোধহয় বাস্তবে সফল হয়না।

মানুষ দোষে-গুণে। জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে গুণের পাল্লাটা কম ভারি নয়। আর সে কারণেই তাঁর বিকল্প অনুসন্ধান খুব একটা সহজ কাজ নয়। তাঁর গুণের তালিকা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশও অবশ্যই থেকে যায়। জ্যোতিবাবু ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূত নন অথবা নিজের দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা কোন বটবৃক্ষও নন।

জ্যোতি বসুর পর কে—এই কথা মনে করলেই জনশ্রুতি ও জনান্তিকে যেসব নাম শোনা যায় আমরা মূলত সেই নামগুলি নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

প্রথমেই যে নামটি মনে আসে তা হল প্রমোদ দাশগুপ্ত। একাধারে পলিটব্যুরো, সেনট্রাল কমিটি, রাজ্য কমিটি—এই তিন জায়গাতেই তাঁর আসনটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশাসনিক কর্ণধারইবা হবেন না কেন? এক কথায় এ প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া যায়। এর কারণ প্রশাসনিক শীর্ষে আরোহণ করার চাইতে প্রমোদবাবুর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অধিকার এবং আগ্রহ অনেক বেশি। এই প্রস্তাব সর্ব প্রথম নাকচ করে দেবেন প্রমোদবাবু নিজেই। ক্ষমতায় আসুন অথবা নাই আসুন—আজ পর্যন্ত কোন কারণে মহাকরণ বা বিধান-সভায় প্রমোদবাবুর পদধূলি পড়েনি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি রাজভবনে গিয়েছেন মাত্র একবার। তাছাড়া শারীরিক দিক থেকেও, তিনি শক্তি হারাচ্ছেন। নিয়মিত চিকিৎসাধীন কোন ব্যক্তিকে জ্যোতিবাবুর বিকল্প হিসেবে ভাবা নিতান্তই অলীক কল্পনা।

কেউ কেউ বলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের নাম। সি পি আই (এম) দলে স্নেহাংশুবাবুর গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তাছাড়া জ্যোতিবাবুর আকৈশোর সঙ্গীদের মধ্যে এক নমবর নাম স্নেহাংশুকান্ত। জ্যোতিবাবু যখন লনডনে মার্কসবাদের দীক্ষা নেন, তখনও তাঁর সঙ্গে স্নেহাংশুবাবু; আর আজও বামফ্রনট সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে মহাকরণের করিডরে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চলেন তিনি।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে অন্তবর্তী নির্বাচনের পর শরিকী দলগুলির মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দ্বন্দ্ব নিয়ে যে উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক হয়, তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্নেহাংশু আচার্যের নিউ আলিপুরের বাড়িতেই। ঐ বছর ২০ ফেব্রুয়ারি এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হল। সেই বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্নেহাংশুবাবুর বাড়িতেই।

জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে স্নেহাংশু-বাবুকে মাঝে মাঝে বেঘোরে পড়তে হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ৬ এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবরে জলসার ঘটনা নিয়ে যুক্তফ্রনটের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঙ্গে একথাও বলা হয় যে জ্যোতিবাবুর বন্ধু স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং স্নেহভাজন রাম চ্যাটারজি ওই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্নেহাংশু-বাবু তখনও এ্যাডভোকেট জেনারেল। তাছাড়া এই সরকারের আমলে এম এল এ ভাঙানোর কাজে যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে স্নেহাংশু আচার্যও ব্রতী হন। এই সময়ে রাজ্যপালের মনোভাব সি পি এম-মুখী রাখার জন্য স্নেহাংশু আচার্য শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। —এমন কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের পুরস্কার দেবার কথা কেউ কেউ ভাবতে পারেন।

তাছাড়া বাদী-প্রতিবাদী সব মহলেই স্নেহাংশুবাবু অসম্ভব জনপ্রিয়। রসিক লোক। কপট কৌতুক প্রদর্শনে তুখোড়। স্বদেশ-বিদেশ—সর্বত্রই তার অবাধ প্রবেশ। এ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল পর্যন্ত তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্মৃতিশক্তি অসামান্য। জীবনে একবার যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, ২০ বছর পর তার নাড়িনক্ষত্র গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। অবশ্য ব্যবহারজীবী



হিসেবে তাঁর পেশাগত সাফল্য এর একটা বড় কারণ।

বামফ্রনট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে খেলাধুলার আসরেও স্নেহাংশুবাবু কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে বেশ শিরোমণি হয়ে উঠেছেন। খেলাধুলা বিভাগের চাবিটি জ্যোতিবাবুর হাতে। এই সুবাদে স্নেহাংশুবাবুর সুযোগটাও অনেক বেশি। মূল লক্ষ্য পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী যাতে মাথাচাড়া দেবার সুযোগ বেশি না পান।

তবে নেতা হতে গেলে জনসাধারণের মধ্যে একটা ইমেজ অবশ্যই দরকার। স্নেহাংশুবাবুর কিন্তু সেটা লাভ করার সুযোগ হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বহু মানুষেরই বিপদের বন্ধু। তাছাড়া জ্যোতিবাবু এবং স্নেহাংশুবাবু—উভয়েই সমবয়স্ক। তাই তাঁকে জ্যোতি-বাবুর পরবর্তী বিকল্প ভাবা কষ্টকর। বামপন্থী রাজনীতি করতে গিয়ে স্নেহাংশুবাবু

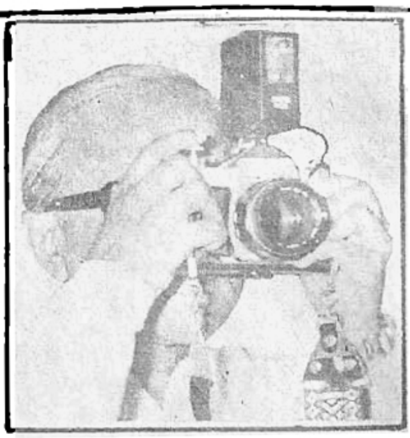
কারাবরণ করেছেন। বর্তমানে সরকারীভাবে সি পি এমের সদস্য না হলেও দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য অসামান্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন তিনি নিজেও দেখেন না।

আর একটি নাম সরোজ মুখোপাধ্যায়। সরোজবাবু রাজ্য কমিটির সদস্য। দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রচারিত মুখপত্র 'গণশক্তি'র সম্পাদক। দলের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে (বিশেষ করে রাজ্যপর্যায়ে) সরোজবাবুর উপস্থিতি কাম্য। দলের প্রতিনিধি হিসেবে চীনের মতো বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশে তাকেও সস্ত্রীক সফরে পাঠানো হয়। নেতাদের অনুপস্থিতিতে তিনিই সাংবাদিকদের কাছে দলের অন্যতম মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন।

পাঞ্জাবী ধুতি পরা সিধেশাদা মানুষ। পোশাকে চাকচিক্য, এমন কি কোন বাহুল্য নেই। সব সময়েই মুখে হাসি লেগে আছে। কোমল স্বভাবের মেজাজ। বরাবরই সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কোনদিন বিধান-সভায়ও প্রতিনিধি হিসেবে আসেননি। তবে লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। সরকারী কার্যক্রম ও কর্মধারার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। জনসভায়ও বক্তৃতা করার কোন অভ্যেস নেই। ফলে ব্যক্তি হিসেবে আলাদা করে কোন ইমেজ গড়ে তোলার সুযোগ হয়নি। রাজভবনে কোন কোন বৈঠকে দু-একবার দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে গেছেন। কিন্তু মহাকরণ বা বিধানসভার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং সরোজবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আদৌ নিজেকে কখনও ভেবেছেন বা ভাবেন বলে মনে হয় না। আগামী দিনে তরুণদের মধ্য থেকে নেতা খুঁজে নেবার কোন পরিকল্পনা থাকলে ষাটের ঘরে পৌঁছানো সরোজবাবুর নাম অকল্পনীয়।

তাহলে কি জ্যোতি বসুর পর জ্যোতির্ময় বসু? বাঘা চেহারা। রাজনীতিতে আসার আগে মিলিটারিতে ছিলেন। দুরন্ত মেজাজী, বেপরোয়াভাব।

জ্যোতির্ময়বাবু সংসদীয় রাজনীতিতে পোড়খাওয়া লোক। পারলামেনটে তাঁর গলা সপ্তমে চড়ে থাকে। সরকারী দুর্নীতি ও বে-আইনী কাজকারবার ওঁর চোখ এড়ানো বড় শক্ত। পাবলিক এ্যাকাউনটস কমিটি, পাবলিক আনডারটেকিং কমিটি, তথ্য ও বেতারের পরামর্শদাতা কমিটি—এইসব করে সরকারী প্রশাসনের অলিগলি এবং জোড়াতালি তাঁর নখদর্পণে। মারুতি কেলেঙ্কারী ও নাগরওয়ালা ঘটনায় কংগ্রেসকে নাস্তানাবুদ করার জন্য দেশের সংসদের ইতিহাসে ওঁর নাম অনেকদিনই লেখা থাকবে।



এত করেও কি তিনি জ্যোতিবাবুর বিকল্প হতে পারবেন? তাঁর দল কি ভাবছেন?—জবাবে বলতে হয় তেমন কিছু শোনা যায় না। বরং তাঁকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথাই শোনা যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে জ্যোতির্ময়বাবুর দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পাওয়াই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনতা সরকারের ওপর থেকে দল যখন সমর্থন তুলে নিয়েছে, তখনও জ্যোতির্ময়বাবু তাদের সমর্থনের পক্ষেই মত দিয়ে যাচ্ছিলেন—এতে পারটির কর্তারা ক্ষুব্ধ। পরে তাঁর আচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মনোনয়ন পান।

জ্যোতির্ময়বাবু রাজ্য নেতৃত্বে কখনই খুব একটা গুরুত্ব পাননি। তাঁর নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকে সি পি আই (এম)। কিন্তু তিনি কার্যত দলের নীতি ও আদর্শ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। পারটি অফিসেও তাঁর যাতায়াত নিতান্তই প্রয়োজন-মাফিক। সেদিক থেকে এবং বয়সের দিক থেকেও জ্যোতি বসুর পরবর্তী হিসেবে ত'ার নাম খুব জোরদার নয়।

তাহলে কে? রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষের নাম উঠতে পারে। দলের গঠনমূলক কাজের পর্বে শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে গড়ে ওঠা শ্রমিক নেতা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি দলের শ্রমিক শাখা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত তিনি কলে-কারখানায় অফিস-কাছারিতে একাধিক কর্মী সংগঠনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। বয়সে প্রবীণ। অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। 'সিটু' নেতা মনোরঞ্জন রায় প্রমুখের চাইতে কৃষ্ণপদ ঘোষের ইমেজও কম নয়। তাছাড়া রাজ্য কমিটিতেও ত'ার আসন রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন—দলের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের অত্যন্ত কাছের মানুষ কেষ্টবাবু। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও রয়েছে। দলের কর্মীরা অবশ্য বলেন যে, তাদের দলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনই আদর্শকে ছাপিয়ে ওঠে না। কিন্তু দলের অন্দরমহলের খবর যারা রাখেন তারা জানেন যে সংসদীয় রাজনীতির কাছে সুকৌশলে আত্মসমর্পণ করে বসলে, তার 'ভাইসেস'গুলো দলকে প্রভাবিত না করে পারে না, সেদিক থেকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুরুত্ব কেউ কি উড়িয়ে দিতে পারে?

তাছাড়া কেষ্টবাবুকে তো অযোগ্য মনে করা হয় না। গত বছর জুলাই মাসে জ্যোতিবাবু মাস খানেকের জন্য বিদেশ গেলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কেষ্টবাবুর ওপরই বর্তে ছিল। অবশ্য জ্যোতিবাবুর সঠিক বিকল্প হয়ে ওঠার পরিচয় যে সেদিন তিনি দিতে পেরেছেন, তা নয়। সান্তালদিতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও মুরশেদের দ্বন্দ্ব নিয়ে কেষ্টবাবু বিদ্যুতের সাময়িক ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী অশোক মিত্রের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করতে ছাড়েননি। জ্যোতিবাবু থাকলে কিন্তু কাজটা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গেই করতেন। ফিরে এসে জ্যোতিবাবু মুরশেদকে সরিয়ে সেই বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছেন। হতে পারে সেটা ত'ার লোক দেখানো কাজ কিন্তু আমলার চাইতে তিনি ত'ার সহকর্মী অর্থাৎ মন্ত্রীকেই ওপরে রেখেছিলেন!

তবে কেষ্টবাবু শ্রমমন্ত্রী হবার পর তিনি বহু শ্রমবিরোধের নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার জন্যই ত'ার পক্ষে কাজটা করা সহজ হয়েছে।

তবে 'পরবর্তী জ্যোতি বসু' হওয়া যে কেষ্টবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়, তার কারণ তিনি নিজেই। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি জটিল রাজ্যের হাল ধরতে গেলে যে মনোবল ও শারীরিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, কেষ্টবাবুর মধ্যে তা নেই। প্রথমত, তিনি বয়সে এখন বেশ প্রবীণ, তার ওপর তিনি শারীরিক দিক থেকেও অপটু। ছুটোছুটি তো দূরের কথা, সভা-সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রেও ত'ার শরীর সব সময় ত'াকে সম্মতি দেয় না।

তবে কে? কেউ কেউ অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের নামও বলেন। চাঁচাছোলা লোক। দুমদাড়াক্কা মুখের ওপর যা খুশি তাই বলে দেন। প্রথম প্রথম সাংবাদিকরাও ত'ার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি চটিয়ে কাজ হয় না। তিনি বুঝতে পারেননি যে অপ্রিয় সত্য ভাষণে শত্রু বাড়ালে ত'ার নিজের এবং প্রশাসনের ইমেজ তাতে কখনই বাড়তে পারে না।

সংবাদপত্র কোন সরকারী কাজের সমালোচনা করলে তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠেন। কটুকাটব্যে সাংবাদিকদের ওপর একহাত নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান যে, সাংবাদিকরা কর্মী মাত্র, তারা সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারণ করেন না।

সহকর্মীদের সঙ্গেও তিনি সব সময় সদ্ভাব রাখতে পারেন না।

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী একবার একটি ফাইলে অনুমোদন-স্বাক্ষরের জন্য নিজেই অর্থমন্ত্রীর ঘরে এলেন, বললেনঃ আপনার অনুমোদন দরকার, কাজটা অনেকদিন আটকে আছে, দয়া করে একটা সই। অশোকবাবু জবাবে বললেনঃ অতি অবশ্যই স্বাক্ষর করব। প্রথমত আপনি আমার মাথার ওপর থাকেন. (মহাকরণে দোতলায় অশোক মিত্রের ঘরের ঠিক ওপরে তিনতলায় যতীন চক্রবর্তীর ঘর), দ্বিতীয়ত সই না করলে কালকেই দেখবো আনন্দবাজারে আমার বিরুদ্ধে খবর বেরিয়েছে।

এই হলেন চাঁচাছোলা অশোক মিত্র। তিনি যে রাজনৈতিক কৌশল ব্যতিরেকেই প্রশাসন চালাতে চান, তা আজকের দিনে অচল। তাঁর এই মৌলিক অক্ষমতাটি বামফ্রন্টেরও নজরে এসেছে; তাই তারা ভবিষ্যতে আর তাঁকে সঙ্গে নেবেন কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

এমনিতেই অশোকবাবু সি পি আই (এম) সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে মন্ত্রিত্বে এসেছেন, দলের সদস্য হিসাবে নয়। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটালেও ৭৭-এর নির্বাচনের আগে তিনি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে মারাত্মক রকম সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর কলমের জোর অসামান্য। অর্থনীতি ও সাহিত্য দুটোতেই তাঁর পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়, যা বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কারো নেই। কিন্তু মন্ত্রিত্ব ও পাণ্ডিত্য আজকের দিনের রাজনীতিতে শুভ সমন্বয় নয়।

অবশ্য অশোকবাবু যে সরকারী প্রশাসনের হালচাল বোঝেন না তা নয়। যোজনা কমিশন, কৃষি পণ্যমূল্য নির্ধারণ কমিশন—ইত্যাদি বহুঘাটের জল খেয়েছেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা বিদেশেও সমাদৃত। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছেন, মন্ত্রিত্বে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ভাল করেননি। ফ্রন্টের ভাল লাগছে না, সহকর্মীদের সঙ্গেও বনিবনা হচ্ছে না, অশোকবাবুর নিজেরও ভাল লাগছে না। তিনি বুঝে গেছেন মূরশেদের সঙ্গে ভদ্রলোক ও কমিউনিসটের তত্ত্ব নিয়ে তর্ক তুললে তাকে কেউই ভাল চোখে দেখবেন না, মুষ্টিমেয় নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী লোক ছাড়া।

তাই অশোকবাবু জনান্তিকে বলে ফেলেছেনঃ এই পাঁচ বছরের মন্ত্রিত্ব ফুরোলেই তিনি 'মুক্তিস্নান' সারবেন। রাজ্যের নেতৃত্ব নৈব নৈব।

অতঃপর কার নাম? বিনয় চৌধুরী? বিনয়বাবু রাজ্যের ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী। তিনি কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। কৃষক

সি পি এম পলিটব্যুরোর সদস্য কারা

১। জ্যোতি বসু
২। প্রমোদ দাশগুপ্ত
৩। সমর মুখোপাধ্যায়
৪। বি টি রনদিভে
৫। বাসবপুন্নাইয়া
৬। পি রামমূর্তি
৭। হরকিষেন সিং সুরজিত
৮। পি সুন্দরায়া
৯। ই এম এস নামবুদ্রিপাদ
১০। বালা সুব্রহ্মণ্যম
১১। ই বালানন্দন

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি পি এম সেনট্রাল কমিটির সদস্য

১। জ্যোতি বসু
২। প্রমোদ দাশগুপ্ত
৩। সমর মুখোপাধ্যায়
৪। সরোজ মুখোপাধ্যায়
৫। মনোরঞ্জন রায়
৬। বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী
৭। কৃষ্ণপদ ঘোষ

ফ্রন্টে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। ভূমিহীন কৃষক তথা বর্গাদারদের স্বার্থ নিয়ে



তিনি বেশি মাত্রায় চিন্তিত।

'বর্গা অপারেশন' নিয়ে বামফ্রনট যে কৃতিত্ব দাবি করে বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটাতে বিনয়-বাবুই তৎপর রয়েছেন। তিনি যত এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারবেন, ততই গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে দরিদ্র-কৃষকদের কাছে বামফ্রনটের ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। অনেকটা হয়েছেও। তার কৃতিত্ব অনেকটাই বিনয়-বাবুর। সি পি আই (এম) যদি কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় একটি ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পায়, তবে তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষে বসাতে অসম্মত হবে না। কেন না, তারা এই কথা সবাই জানে যে, কৃষকরাই জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, তাদের মন জয় করতে পারলে—আর কি চাই?

বিনয়বাবুও রাজ্য কমিটির সদস্য, তবে তাঁকে জ্যোতিবাবুর পরবর্তী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে এমন কথা শোনা যায় না। তবে হ্যাঁ। রাজ্যে গত তিন বছরে এমন অনেক জেলা-ভিত্তিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বিনয় চৌধুরীকেই সমাধানের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি সাধ্যমত সে কাজ করেছেন। বে-আইনী জমিদখল; ব্যাপকমাত্রায় ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের অপবাদ ও ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হয়। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, জনসাধারণের মন জয় করার মতো ব্যক্তিত্ব বিনয়বাবুর মধ্যে ততটা প্রকট নয়। তবে আপাত চোখে যা অসম্ভব, বাস্তবে তা সম্ভব কিনা ভবিষ্যৎই তা বলে দেবে।

এই গেল প্রবীণ ও প্রাক-প্রবীণের দল। এবার নবীনদের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। জ্যোতি বসুর পর কে—বিষয়টি নিয়ে যদি সত্যি ভাবতে হয় তবে নবীনদের মধ্যে তার অনুসন্ধান করা অনেক বাস্তবোচিত।

কিন্তু নবীন বয়সে সেই প্রতিশ্রুতিটি কার মধ্যে আছে? সি পি এম-এর রাজ্য নেতারা বা ক্যাডাররা কী ভাবছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত কিন্তু গত বছর কলকাতায় রাজ্য সম্মেলনের সময় সাংবাদিকদের কাছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামটি বলে ফেলেছিলেন। বুদ্ধদেব বর্তমানে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী।

ছাত্র সংগঠন ও যুব সংগঠনের পথ ধরে তিনি আজ মহাকরণে বেঁটেখাটো মন্ত্রী। মন্ত্রী হয়েও তিনি যুব সংগঠনের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেননি।

বুদ্ধদেব সাতাত্তরে প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে হারালেন। বিধানসভায় এসে আর সাধারণ সদস্যের আসনে নয়, সরাসরি মহাকরণে গিয়ে মন্ত্রীর চেয়ারে বসলেন। তবে এটাকে ঠিক 'আসিলাম, দেখিলাম জয় করিলাম' বলা যায় না। কঠিন কঠোর আন্দোলনের মধ্যে তাঁর পরীক্ষা দিতে

হয়েছে।

প্রমোদবাবুর খুবই অনুগত ও প্রিয়পাত্র বুদ্ধদেব। তিনি ওঁর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা দেখতে পান। তাছাড়া ওর হাতে রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। জেলায় জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোক উৎসব, ওয়ারকশপ, যুব সমাবেশ, সেই সঙ্গে শহরের বুকে নিত্য-নতুন অভিনব প্রদর্শনী, বিদেশী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু উৎসব—এ সর্বকিছুই সাধারণের মন জয় করার সহজ মাধ্যম। বুদ্ধদেব সেটা সাধ্যমত সুকৌশলেই ব্যবহার করছেন।

তাছাড়া জ্যোতিবাবুর পরিশীলিত ভঙ্গী একমাত্র বুদ্ধদেবেরই অনেকটা আয়ত্বে। মেপে কথা, ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য, বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গী, দলের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি, বুদ্ধদেবের চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে।

সি পি এমের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও বুদ্ধদেবকে শীর্ষস্থানে জায়গা দিলে কেউই তেমন আঁতকে উঠবেন না। এ পর্যন্ত যতগুলি বিকল্প নামের আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধদেবের নামটি বেশ লাগসই এবং জোরালো। রাজ্য কমিটিরও অন্যতম সদস্য বুদ্ধদেব।

মন্ত্রী না হতে পারেন, দীনেশ মজুমদার, বিমান বসুর মত যুব নেতাও তো রাজ্য কমিটিতে রয়েছেন। বুদ্ধদেবের পাশাপাশি তাঁদের কথাও কি ভাবা যায়? দলের কোন কোন দ্বিতীয় সারির নেতার মতেঃ কেন ভাবা যাবে না? যুব সংগঠন তো তাঁরাও দীর্ঘদিন ধরে করছেন।

দীনেশ মজুমদার বিধানসভায় দলের চীফ হুইপ। বিধানসভার চত্বরে স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রতিদিন যে আগুন জ্বলে ওঠে, তাকে শীতল করতে দীনেশের ভূমিকা কিন্তু কম নয়। হয়তো বিরোধী দলের কোন সদস্যের মন্তব্যে সরকারী পক্ষের সদস্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, সেখানে স্পীকার মনসুর হবিবুল্লা ব্যর্থ হলেও তাদের শান্ত করতে দীনেশকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মার্জিত ব্যবহার এবং সকলের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রচনার মধ্যে দিয়েই দীনেশ তা করতে পারেন। বহু ক্রুদ্ধ সদস্যকে দীনেশ শুধুমাত্র চোখের ইশারায় অথবা হাত তুলেই নিবৃত্ত করতে পারেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে যখন বিরোধী সদস্যরা স্পীকারকে নাস্তানাবুদ করতে থাকেন, তখন দীনেশের ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বরটিও বেশ কার্যকরী হয়। বিধানসভায় প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে যে দু'জনের কথা বিরোধীরা শান্ত হয়ে শোনেন—সেই দু'জন হলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং দীনেশ মজুমদার।

এদিক থেকে দীনেশ মজুমদার যে শুধু নিজ দলের সদস্যদের কাছেই প্রিয় তাই নয়, বিরোধীদের সঙ্গেও তিনি একটি মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। কৌশলভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রয়োজন।

বিমান বসু মন্ত্রী হননি, বিধানসভার সদস্যও নন। কিন্তু রাজ্যে যুব নেতাদের মধ্যে তিনি বেশ জনপ্রিয়। বুদ্ধদেব-দীনেশ-বিমান এরা বয়সে উনিশ বিশ। কিন্তু রাজ্যে দলের মধ্যে বিমানের জনপ্রিয়তা কম নয়। তাছাড়া তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে দলের নেতা থেকে দলীয় মন্ত্রী পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে। তবে বিমানের সম্ভাবনা সম্পর্কে রাতারাতি মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

এইখানেই যদি আলোচনা শেষ করি তবু একজন অবশিষ্ট থাকেন। তাঁর কথা দলের কারও মুখে শোনা যায় না, কিন্তু নির্দলীয় সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখলে অনেকেই তাঁর নাম বলেন। তিনি হলেন প্রশান্ত শূর। বর্তমানে পৌর ও শহর উন্নয়ন মন্ত্রী। দল তাকে রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেয়নি ঠিকই, জনসাধারণের মনে কিন্তু, তিনি গত তিন বছরেই 'মিনিসটার অব দ্য ইয়ার।' কেন? প্রশান্তবাবু এমন একজন মন্ত্রী যিনি কাজের মধ্য দিয়ে সরাসরি জনপ্রিয় হয়েছেন।

কাজ বলতে কি? শহরের জঞ্জাল সাফাই, রাস্তাঘাট তৈরি, হকার উচ্ছেদ, পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ—এই সব কাজগুলিই যে প্রশান্তবাবু চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে করতে পারছেন—এমন কথা তিনি নিজেও বলেন না। কিন্তু তাঁর অবিরাম প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। কলকাতার সমস্যা তাঁর নখ দর্পণে, পুরসভার প্রশাসনিক চক্রজাল সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। তাই কলকাতার সমস্যা সমাধানের জন্য নীতি নির্ণয় করা তাঁর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাঁর অসুবিধে হয় সিদ্ধান্ত বা নীতি প্রয়োগে। কিন্তু কোনটিতে ব্যর্থ হলেই তিনি হাল ছাড়েন না। সব সময়েই লেগে আছেন। যদি দেখেন বেইলিফদের দিয়ে পৌরকর আদায়ের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তিনি কর আদায়ের দায়িত্ব ব্যাঙ্কের হাতে দিয়ে দেন, এতে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

সরকারী 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙার কাজে প্রশান্ত বাবুর যে অদম্য উৎসাহ, তার জন্য তাঁকে মারমুখী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মহাকরণে নিজের চেয়ারে নয়, মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করতে প্রশান্তবাবু ভালবাসেন।

গতবছর চেতলায় কিছু বস্তিবাসীদের স্থানান্তরিত করতে গিয়ে তাঁকে এক মহিলার আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। মহিলাটি তাঁর হাত কামড়ে দিলে তার জন্য প্রশান্তবাবু মাস তিনেক হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁর মুখ পর্যন্ত বেঁকে যাচ্ছিল। এই মারাত্মক আক্রমণের মুখে পড়েও তাঁর উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি। পৌর উন্নয়নের কাজে অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রশান্তবাবু বিদেশেরও কয়েকটি রাষ্ট্র সফর করেছেন।

এরকম একটি উৎসাহী প্রাণবন্ত সাহসী মানুষের সম্ভাবনা একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া শহরের জনপ্রিয়তাও অনেক সময়ে প্রচারের গুণে গ্রামাঞ্চলকেও প্রভাবিত করে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, দলে প্রশান্তবাবুর ইমেজ কি রকম? রাজ্য নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ এগোতে পারেননি। দলের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর তিনি সদস্য। তাই প্রশান্তবাবুকে নিয়ে ভাবনা বেশিদূর এগোতে পারে না।

জ্যোতি বসুর পরবর্তী বিকল্প নিয়ে স্বপ্নজাল বিস্তারের এখানেই ইতি। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে জ্যোতি বসুর এই মুহূর্তের বিকল্প কে? তাহলেও বেশ ধাঁধায় পড়তে হয়। আমরা সাধারণ মানুষ ধাঁধায় পড়লেও শোনা যায়,দলে মোটামুটি একটি নাম স্থির হয়েই আছে। তিনি হলেন সমর মুখোপাধ্যায়। পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি রাজ্যান্তরেও নেতা। অবশ্য তাঁর যোগ্যতা নিয়েও পক্ষে বিপক্ষে অনেক মত থাকতে পারে।

জ্যোতিবাবুর বিকল্প কে হতে পারেন—এ আলোচনার পরও অনেকেই হয়ত বলবেনঃ জ্যোতিবাবুর তুলনা জ্যোতিবাবুই। কোন দু'জন মানুষ যে সম্পূর্ণ এক হতে পারেন না, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাল নিরবধি হলেও মানুষের জীবন তো তা নয়। তাই সব বড় মানুষেরই বিকল্প ভাবতেই হয়, তা না হলে যে ভবিষ্যৎ মানব সমাজ থেমে যাবে আজ হোক কাল হোক, জ্যোতিবাবুর ভূমিকা কাউকে না কাউকে নিতে হবেই, তাঁর দলকেও সে ভাবনা ভাবতেই হবে। ★

আলোকচিত্র: রাজীব বসু



ধাপে ধাপে জননেতা –১৯৩৫ থেকে ১৯৭৭



জ্যোতি বসু রাষ্ট্রপতি রেড্ডিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। পাশে টি এন সিং

জ্যোতি বসু আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সারা ভারতেরই অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট নেতা। বলাবাহুল্য. তিনি রাতারাতি এই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হননি। ধীরে ধীরে অনেক পর্যায় পেরিয়ে তাঁকে আজকের ভূমিকায় পৌঁছাতে হয়েছে। নিচে তারই কালানুক্রমিক রূপরেখা আঁকা হল।

১৯৩৫ : জ্যোতিবাবুর জীবনের প্রথম প্রতিবাদ. তাঁর বাবার স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে। বাবা চেয়েছিলেন, ছেলে আই সি এস হবে। ছেলের মত ছিল না। তিনি আইন পড়লেন কিন্তু আইনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেননি। জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি তৈরি হয় লনডনে। সেখানে ঔপনিবেশিক দেশগুলির ছাত্রমহলে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিলেন—সেই রজনী পাম দত্ত জ্যোতিবাবুকে প্রভাবিত করলেন। সেই প্রথম মার্কসবাদে দীক্ষা। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তখন সমমতাবলম্বী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, রজনী প্যাটেল (বর্তমানে কংগ্রেস নেতা) ও পি এন হাকসার প্রমুখ। তখন লনডনেও একটি বৃটিশ-বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়। 'ইনডিয়া লীগে' কমিউনিসট ও অকমিউনিসট সকলেই ছিলেন। জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী এরাই বেশির-ভাগ জনসভায় ভাষণ দিতেন। 'ইনডিয়া লীগে'র মুখপত্র প্রকাশিত হতো লনডনে। জ্যোতিবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে পত্রিকা বিক্রি করতেন। পরে তিনি লনডনে গ্রেট বৃটেন কমিউনিসট পারটির সদস্যপদ পান। ১৯৩৯ সালে জ্যোতিবাবু বার-এট-ল হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৪১ : কমিউনিসট পারটির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। রেলকর্মীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। আসাম-বেঙ্গল রেল রোড ওয়ার্কারস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময় জ্যোতিবাবু অল ইনডিয়া রেলওয়েমেনস ফেডারেশনেরও সহ-সভাপতি হন। ওই সংস্থার সভাপতি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। উভয় নেতার মধ্যে তীব্র আদর্শগত বিরোধ ছিল।

১৯৪২ : ঢাকার সূত্রাপুরে ফ্যাসীবিরোধী কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখারজি প্রমুখ। জেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন উদ্বোধন করতেও জ্যোতি বসু ও হীরেন মুখারজির ডাক আসতো।

১৯৪৬ : পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রথম প্রবেশ। রেল শ্রমিকদের ভোটে জয়ী হয়েই তিনি বঙ্গীয় বিধানসভায় আসেন। ঐ নির্বাচনে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন হুমায়ুন কবির। সেদিন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আর যে দু'জন কমিউনিসট বিধানসভায় ঢুকতে পেরেছিলেন, তাঁরা হলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলীম লীগ। প্রধানমন্ত্রী হন সারওয়ার্দি। বিরোধী দলনেতা ছিলেন কিরণশংকর রায় (বর্তমান সি পি আই নেতা কল্যাণশংকর রায়ের বাবা)। এই বছরে বাজেট অধি-বেশনের শুরুতে বঙ্গীয় মুসলীম ছাত্র ফেডারেশনের একটি মিছিল বিধানসভায় আসে। ঐ মিছিলে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানও ছিলেন। কলকাতায় তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার জনাব সামসুজ্জোহা কিরণশংকর রায়কে বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেন। জ্যোতিবাবু এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এজন্য সামসুজ্জোহা

‘জোচ্চোরের বিধানসভা’

১৯৭২ সাল। নির্বাচনে বামপন্থীদের ভরাডুবি হল। সি পি এম পেল মাত্র ১৩টি আসন। বরানগরে জ্যোতিবাবু ৩৮ হাজার ভোটে হেরে গেলেন। অন্যদিকে যাদবপুর কেন্দ্রে দীনেশ মজুমদার জয়ী হলেন। জ্যোতিবাবুর ২৫ বছরের পরিষদীয় জীবনে ছেদ পড়লো।

২৮ মারচ বামপন্থীরা ময়দানে জনসভা আহ্বান করলেন। সেখানে সভাপতির ভাষণে জ্যোতিবাবু বলেন ঃ এই বিধানসভা জোচ্চোরের বিধানসভা—একে আমরা মানি না।

জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের অন্যতম ভোটদাতা প্রাক্তন কাউনসিলর শ্যামসুন্দর গোয়েঙ্কা জ্যোতিবাবুর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত বসু বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বলেন ঃ আমরা জ্যোতিবাবুকে ক্ষমা করে দিলাম

জুলাই মাসে জ্যোতিবাবু লনডনে যান। সেখানে ২০ জুলাই এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে রিগিং-এর কথাও বলেন। একদল লোক ঐ সভায় হামলা চালায়। জ্যোতিবাবুর উদ্দেশ্যে পচা ডিম ও টমাটো নিক্ষেপ করে। ছোটখাটো সংঘর্ষে সভার ৫ জন, উদ্যোক্তা আহত হন।

তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। পরে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার্দি সামসুজ্জোহাকে সকলের সামনে জ্যোতি বসুর’ কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন।

১৯৪৮ ঃ এই বছরের প্রথম দিকে কমিউনিসট পারটি বে-আইনী ঘোষিত হয় জ্যোতি বসু সহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে হাইকোরটে মামলা হয়। বছরের শেষ দিকে জ্যোতিবাবু মুক্তি পান।

এরপর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে ভারতের খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা হয়। জ্যোতিবাবু বলেন ঃ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগে গণপরিষদ গঠন করতে হবে। তারপর সংবিধান আলোচনা হবে। নচেৎ সংবিধান গণতান্ত্রিক হবে না।

১৯৫১ ঃ ১০ জানুয়ারি মনুমেনট ময়দানে কমিউনিসট পারটির ডাকে একটি সভা হয়। পারটি বেআইনী হবার পর এটিই ছিল প্রথম প্রকাশ্য সভা। জ্যোতিবাবু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই বছরে তিনি দলের রাজ্যশাখার নেতৃপদে স্থায়ী আসন লাভ করেন। দলের মুখপাত্র ‘স্বাধীনতা’-র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিও নির্বাচিত হন।

১৯৫২ ঃ প্রথম সাধারণ নির্বাচন। কমিউনিসট পারটি রাজ্য বিধানসভায় ২৮টি আসন পায়। জ্যোতিবাবু বরানগর কেন্দ্র থেকে জিতে বিধানসভায় আসেন। শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্র চৌধুরী তাঁর কাছে হেরে যান।

১৯৫৩-৫৪ ঃ জ্যোতিবাবু দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পান।

১৯৫৫ ঃ চীন সফর। মে-দিবসে পিকিং-এর জনসমাবেশে চীনা নেতাদের সঙ্গে তিনি একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাইয়ের সঙ্গেও আলোচনায় মিলিত হন।

১৯৫৬ ঃ পালঘাটে পারটির চতুর্থ কংগ্রেসেও তিনি আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ ঃ দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতিবাবু আবার বরানগর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। এ বছরই তিনি প্রথম বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার সম্মান পান।

১৯৫৮ ঃ ১০ মারচ সিদ্ধার্থশংকর রায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেন। ২৫ মারচ তিনি বিধানসভায় ৭৮ পাতার একটি বিবৃতি পেশ করেন। ঐদিনই জ্যোতিবাবু বিধান রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এইটিই কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব।

১৯৫৯ ঃ বিরাট খাদ্য আন্দোলনের সময়ে জ্যোতিবাবুকে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়। খাদ্য আন্দোলনে পুলিশী গুলি চালনার বিরুদ্ধে জ্যোতিবাবু বিধান রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ৩১ আগসট আবার অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ৬৪-১৫৭ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ঐদিন পুলিশমন্ত্রী কালিপদ মুখারজির উদ্দেশ্যে কয়েকজন সদস্য জুতো নিক্ষেপ করেন। কালিপদবাবু অভিযোগ করেন ঃ জ্যোতি বসু জুতো ছুঁড়েছেন। জ্যোতিবাবু তখন আসন ছেড়ে উঠে নিজের জুতোজোড়া দেখিয়ে দেন।

১৯৬২ ঃ জ্যোতিবাবু আবার বরানগর কেন্দ্রে জয়ী হলেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ কেশব বসু তাঁকে আবার বিরোধী দলনেতা বলে ঘোষণা করলেন। জাতীয় পরিষদে দলের সম্পাদকমণ্ডলীতে জ্যোতিবাবু সদস্যপদ লাভ করেন। দলের নীতিনির্ধারক সংস্থাই হল এই জাতীয় পরিষদ। জুন মাসে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে জ্যোতিবাবু মসকো যান।

চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিবাবু গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই বন্দী অবস্থায় জ্যোতিবাবুর পিতৃবিয়োগ ঘটে। আদ্যশ্রাদ্ধের দিন তাঁকে কিছু সময়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৬৩ ঃ ১৯ ডিসেমবর জ্যোতিবাবু মুক্তি পান। আদর্শগত প্রশ্নে দলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জোর আলোচনা চলে।

১৯৬৪ ঃ ৯ এপরিল সি পি আই জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে। তার আগে ৫ এপরিল বাম কমিউনিসট নেতারা ডাঙ্গে-পত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। ৯ জন নেতা এক বিবৃতিতে বলেন যে ডাঙ্গে ঐসব চিঠি লিখে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহভাজন হতে চেয়েছিলেন। ডাঙ্গে ‘লিঙ্ক’ পত্রিকার ৩০ হাজার টাকার শেয়ার কিনলেন কি করে?—এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে অন্যান্যদের সঙ্গে জ্যোতি বসুও স্বাক্ষর করেন।



বিরোধী নেতা হিসেবে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে জ্যোতি বসু

১১ এপ্রিল দল কার্যত ভাগ হয়ে যায়। অন্ধ্র প্রদেশের তেনালী কনভেনশনে 'জ্যোতি বসু প্রমুখের দলিল'-এর ওপর জোর বিতর্ক হয়। ৩১ অক্টোবর কলকাতার ত্যাগরাজ হলে পারটির সপ্তম কংগ্রেসে বিদেশী প্রভাব-



১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্ত ফ্রন্টের সময়ে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করছেন জ্যোতিবাবু

কংগ্রেসে যাননি

১৯৬২ সাল তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রধান অতুল্য ঘোষ জ্যোতি বসুকে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিলে তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে—এমন কথাও বলা হয়েছিল। জবাবে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার প্রথম দিন থেকেই কমিউনিসট পারটিতেই আছেন এবং শেষদিন পর্যন্ত কমিউনিসট পারটিতেই থাকবেন।

মুক্ত একটি দলিল গৃহীত হয়। এই কংগ্রেস পরিচালনা করেন জ্যোতিবাবু। ৭ নভেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে জ্যোতিবাবুই ভাষণ দেন। এবারেও সংশোধনবাদ বিরোধী আদর্শে গঠিত নতুন পারটির কথা ঘোষণা করেন জ্যোতিবাবু। দলের নাম হয় কমিউনিসট পারটি অব ইনডিয়া (মার্কসিসট)।

১৯৬৫ : মারচ মাসে কেরলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে জ্যোতিবাবু প্রচারে অংশ নেন। জুলাই মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্র্যাসী' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকায় প্রথম সম্পাদক হন জ্যোতি বসু। আগসট মাসে ট্রাম ভাড়া আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিবাবু আবার গ্রেপ্তার হন।

১৯৬৬ : ফেবরুয়ারি থেকে আবার খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। জ্যোতিবাবু তখনও জেলে। মারচ মাস নাগাদ তিনি মুক্তি পান। ৬ এপ্রিল খাদ্যের দাবিতে বাংলা বনধ আহ্বান করা হয়। ৩ মে জ্যোতিবাবু উৎপল দত্ত পরিচালিত 'কল্লোল' নাটকের বিজয় উৎসবে যোগ দেন।

১৯৬৭ : চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতিবাবু বরানগর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। বিধানসভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে অকংগ্রেসীরা মোট ১৫৩টি আসন পান। রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রনট সরকারে জ্যোতিবাবু উপমুখ্যমন্ত্রী, পরিবহণ ও অর্থদপ্তরের ভার পেলেন। ১৪ জুলাই পরিবহণমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবু ট্রাম কোমপানির পরিচালনভার অধিগ্রহণ বিল উত্থাপন করেন। ৮৮ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের হাতে আসে।

১৯৬৮ : কোচিনে অনুষ্ঠিত পারটির অষ্টম কংগ্রেসে জ্যোতিবাবু আবার পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ : মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার যুক্তফ্রনট ক্ষমতায়। জ্যোতিবাবু তাঁর নিজ কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জিতলেন। আবার উপ-



গ্রেপ্তার বরণ করছেন
জ্যোতি বসু

মৃত্যুর মুখে পা রেখে

১৯৭০ সাল। ৩১ মারচ। যুক্তফ্রনট ভাঙার ১৫ দিনের মাথায় পাটনা রেল স্টেশনে জ্যোতিবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি করা হল। এই ঘটনায় একজন পারটি সমর্থক প্রাণ হারান। নাম আলি ইমাম। এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বেরিয়ে পড়ে। ঘটনার পরদিন শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসভায় জ্যোতিবাবু বলেন : মানুষের মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত আছি। যতদিন সেই কাজ শেষ না হচ্ছে, ততদিন বাঁচতে ইচ্ছা করে। প্রধানমন্ত্রীও ট্রাংক-টেলিফোনে জ্যোতিবাবুর কুশল নেন।

১৯৭১ সাল। ২৬ ফেবরুয়ারি বেড়াচাঁপায় নির্বাচনী ভাষণ দিয়ে বসিরহাট যাবার পথে হরিশপুরে জ্যোতিবাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর তিনটি বোমা ছোড়া হয়। ফেরার পথে আবার তাঁর গাড়িতে বোমা পড়ে। তবে সেবার বোমা ২টি ফাটেনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লা রসুল ও শান্তিময় ঘোষ।

এর আগে ২ ফেবরুয়ারি আমডাঙা থেকে সভা করে ফেরার পথে মীরহাটির কাছে জ্যোতিবাবুর গাড়িতে আবার বোমা পড়ে। ঐ সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন জ্যোতিবাবু সেই সঙ্গে হাতে এলো স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এই স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে কেন্দ্র করেই জ্যোতিবাবু বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ফ্রন্টে ফাটল দেখা দেয়।

১৯৭০ : গোড়ার দিকে ফ্রন্ট ভাঙার মুখে। জ্যোতিবাবু ও মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখারজির মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। মহাকরণে পাশাপাশি ঘরে বসে তাঁরা পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিচ্ছেন। ২৮ জানুয়ারি জ্যোতিবাবু প্রথম স্বীকার করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিসট পারটির মূল্যায়ন ভুল ছিল। এই প্রথম ভারতের একজন প্রথম সারির কমিউ-নিসট নেতা নেতাজী সম্পর্কে বিপরীতধর্মী কথা বললেন।

১৬ মারচ অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেন। ১৪১ জনের সমর্থন দেখানো সম্ভব হয়নি বলে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার গঠন সম্ভব হল না।

১৯৭১ : মধ্যবর্তী নির্বাচনে বরানগরে জ্যোতিবাবু ও অজয়বাবুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অজয়বাবু হেরে যান। সি পি আই (এম) ৮৮টির জায়গায় ১১৫টি আসন পেল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জ্যোতিবাবু সরকার গঠনের দাবি করেন। কিন্তু ২ এপ্রিল অজয় মুখারজি আবার মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজয় সিং নাহার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৪ জুন যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ কর খুন হন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অজয় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবি ওঠে। ২৫ জুন অজয়বাবুর সুপারিশে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান বিধানসভা ভেঙে দেন।

১৯৭২ : সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতিবাবুর পরাজয়, সি পি আই-এর শিবপদ ভট্টাচার্য ৩৮ হাজার ভোটে জিতে গেলেন।

১৯৭৭ : সাতগাছিয়া কেন্দ্রে জ্যোতিবাবুর জয়। সি পি আই (এম)-এর একক নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা। জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ। এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সেই পদেই আছেন। ★

আলোকচিত্র ঃ অশোক বসু

বসু পরিবার

বিশেষ প্রতিনিধি



মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে যাবার ঠিক আগে জ্যোতি বসু, পাশে পত্নী কমল বসু। ২১ জুন, ১৯৭৭, রাজভবন

১৯১৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতার হ্যারিসন রোডের একটি বাড়িতে জ্যোতি বসুর জন্ম। বাবার নাম ডাঃ নিশিকান্ত বসু। মা হেমলতা বসু। নিশিকান্ত বসু ছিলেন নামী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার। জ্যোতিবাবুর পিতামহ রজনীকান্ত বসু ছিলেন গৌহাটিতে আদালতের সেরেস্তাদার। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ নিশিকান্তই জ্যোতিবাবুর বাবা।

প্রথমে কলকাতায় জ্যোতিবাবুদের নিজস্ব বাড়ি ছিল না। হ্যারিসন রোড, সমবায় ম্যানসন, ফ্রী স্কুল স্ট্রিট, হিন্দুস্থান বিলডিংস প্রভৃতি জায়গায় ভাড়াটে থাকার পর নিশিকান্ত হিন্দুস্থান পারকে এক বিঘা জায়গা কেনেন। ১৯২৪ সালে তিনি সেখানে বসতবাড়ি বানান।

নিশিকান্তবাবুর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। পুত্ররা হলেন সৌরীন্দ্রকিরণ এবং জ্যোতিকিরণ (জ্যোতি বসু)। একমাত্র কন্যা 'সুধা'। জ্যোতিবাবুর ডাক নাম ছিল 'গণা'।

জ্যোতিকিরণকে প্রথমে ধর্মতলার লরেটো স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে দু'বছর পড়ার পর তিনি ভর্তি হন সেনট জেভিয়ার্স স্কুলে। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পর পড়তে আসেন প্রেসিডেনসি কলেজে। ইংরেজি অনার্সের ছাত্র ছিলেন। মেধা এবং পড়াশুনোয় কৃতিত্বের জন্য তিনি কয়েকবার স্কুল কলেজে পুরস্কৃতও হয়েছেন।

কলেজ পর্ব শেষ করার পর ১৯৩৫ সালে ২১ বছর বয়সে জ্যোতিকিরণ বিলেতে পড়তে যান। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে আই সি এস হোক। তাতে জ্যোতিবাবু নিজেই বাদ সাধলেন। অগত্যা তাঁকে আইন পড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। সেই অনুযায়ী তিনি সেখানে মিডল টেমপলে ভর্তি হলেন। এখানেই জ্যোতিবাবুর রাজনীতিতে হাতেখড়ি।

জ্যোতিবাবুর দিদি সুধা দেবীর বিয়ে হয় প্রেসিডেনসি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ স্নেহময় দত্তর সঙ্গে। দাদা সৌরীন্দ্রকিরণের বিয়ে হয় জলপাইগুড়ির রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের কন্যার সঙ্গে। তাঁর শাশুড়ী রানী অশ্রুমতী দেবী কংগ্রেসের এম এল এ ছিলেন। জ্যোতি-বাবুর দাদা প্রায় এক বছর হল মারা গেছেন। দিদি সুধা দেবীর ছেলে অমল দত্ত আইনজীবী। তিনি সি পি এম প্রার্থী হিসেবে ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনতা প্রার্থীর কাছে হেরে যান।

বিদেশে আইনের পাঠ সেরে ঘরে ফিরতে না ফিরতেই জ্যোতিবাবুর বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেন তাঁর বাবা। ঈশান ঘোষের নাতনী শ্রীমতী ছবি দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় জ্যোতিবাবুর। দুর্ভাগ্যবশত ছবি দেবীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছবি দেবী টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। ডাঃ বিধান রায় নিজে তাঁর চিকিৎসা করেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে ছবি দেবী মারা যান।

জ্যোতিবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ১৯৪৮ সালের ৫ ডিসেমবর। পত্নীর নাম শ্রীমতী কমল বসু। বিয়ের আড়াই মাস পরেই জ্যোতিবাবু আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কমিউনিসট পারটি তখন বেআইনী। এক বছর পর তাঁর একটি কন্যা জন্মায়। কমল দেবীর ভাই সুধাময় এই সংবাদটি জ্যোতিবাবুকে দেবার জন্য গোপন আস্তানায় গেলেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জন্মের মাত্র ৯ দিন পর জ্যোতিবাবুর সেই কন্যা মারা যায়। তিনি তখন কারাগারে।

জ্যোতিবাবুর একমাত্র পুত্র চন্দনের (ভাল নাম সুব্রত) জন্ম ১৯৫২ সালের ১২ সেপটেমবর। চন্দনের বিয়ে হয়েছে। সে বর্তমানে এক মেয়ের বাবা। ঠাকুরদা আদর করে নাতনীর নাম রেখেছেন—মিতা। ★

আলোকচিত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে

কে বেশি জনপ্রিয়— বিধান রায়, না জ্যোতি বসু ?



বিধান রায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দিচ্ছেন জ্যোতি বসু

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছ'জন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে। সময় অনুক্রমে এই ছ'জন হলেন—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং জ্যোতি বসু।

এ'দের মধ্যে ডঃ ঘোষ দু'বার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন। তিনি প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। তাঁর মন্ত্রিত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করেন। তবে স্বল্পকাল স্থায়ী মন্ত্রিত্বে ডঃ ঘোষ সেবার যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। নানা সমস্যা তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। কমিউনিসটদের কার্যকলাপ এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মন্ত্রিসভার সামনে বিরাট চ্যালেনজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কালো-

অরূপ ভট্টাচার্য

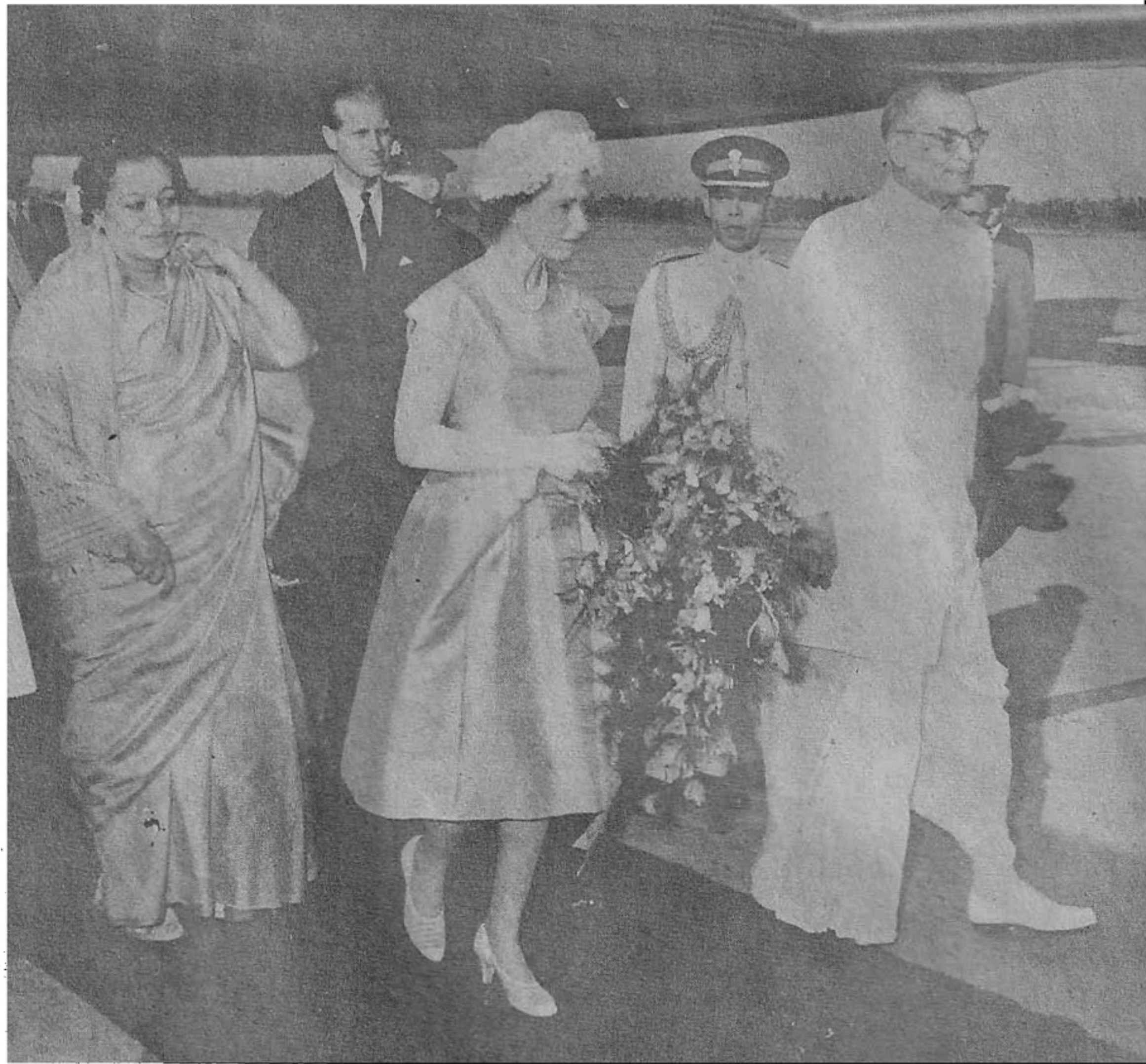
বাজারি এবং দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যও ডঃ ঘোষ বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। মদ খেতেন বলে এক পুলিশ অফিসারের প্রমোশন আটকে দিয়ে ডঃ ঘোষ তাকে শাস্তি দেন। অফিসার ভদ্রলোক কথা দেন তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবেন। মাস দুই পর মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন—অফিসার তার কথা রেখেছেন। তাকে প্রমোশন দিয়ে হেড কোয়ারটারসে নিয়ে আসা হয়।

গোপন সংবাদ পেয়ে একবার ডঃ ঘোষ উত্তর কলকাতার এক ময়দা কলে গিয়ে হাজির। দেখলেন, ব্যাগ ভর্তি তেঁতুল বিচি। গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মেশানো হবে। সেগুলি আটক করা হল কলের মালিক শাস্তি পেল।

ডঃ ঘোষের পদত্যাগের কয়েক দিন আগের কথা। তাঁর থিয়েটার রোডের বাড়ির সামনে পারটির লোকেরা এসে জমায়েত হয় দাবি তোলে—অপরাধী হিসাবে আটক করা হয়েছে এমন কিছু লোককে ছেড়ে দিতে হবে মামলাও প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ডঃ ঘোষ তাদের সাফ জানিয়ে দেন—অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি পেতেই হবে, সে পারটির লোকেই হোক বা যে-ই হোক। ডঃ ঘোষকে শাসানি শুনতে হয়—এর জন্য তাঁকে পস্তাতে হবে।

প্রথমবার যে দৃঢ় মুষ্টিতে ডঃ ঘোষ রাজ্যের শাসনযন্ত্র ধরেছিলেন তাতে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু স্বল্প স্থায়ী শাসনকালে তিনি তা দৃঢ়মূল করার সুযোগ পাননি। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বার যখন তিনি রাজ্যের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁকে যেন চেনাই যায়নি। তখন তাঁকে মনে হয়েছিল ক্ষমতার মোহে অন্ধ এক বৃদ্ধ। ক'দিনের ক্রিয়াকলাপে তিনি নিজেই তাঁর আগের ইমেজ নষ্ট করে দিলেন। জনপ্রিয়তা অর্জন দূরে থাকুক, তিনি রাজ্যের অধিকাংশ মানুষকেই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৬২ সালে বিধান রায়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ পান। বিধানবাবুর মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন খাদ্য-মন্ত্রী। তাঁর কখনই খুব একটা সুনাম ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও তিনি যে অবিসংবাদী ছিলেন না, তার প্রমাণ ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর পরাজয়। শ্রীসেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বে জিনিসপত্রের দাম এমন আকাশ-ছোঁয়া হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি নিজেই জনসাধারণকে ভাতের বদলে কাঁচকলা এবং সন্দেশের বদলে আলুসিদ্ধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। বিদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকের পরামর্শও তাঁর উপদেশের সঙ্গে পাল্প করেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য জুড়ে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মারচের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ ৪২ জনকে গুলি করে হত্যা করে। এর মধ্যে বসিরহাটের ১২ বছরের কিশোর নুরুল ইসলাম কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। এতে শ্রীসেনের



রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে বিধান রায় ও পদ্মজা নাইডু

ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। প্রফুল্লবাবু প্রশাসনিক পটুত্ব বা জনপ্রিয়তার তেমন কোন প্রমাণ কোন দিনই দিতে পারেননি।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সহ অধিকাংশ রাজ্যে ভোটারদের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়। তিনবার বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হন। শরিকী অন্তর্দ্বন্দ্বের যথাযথ মোকাবিলা করতে না পেরে তিনি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা হারান।

১৯৭২ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনেকের কাছেই এক বিশাল জিজ্ঞাসা চিহ্ন। তারই মধ্যে এলেন সিদ্ধার্থ রায়। গোষ্ঠী কোঁদল, ওয়ানচু কমিশন, জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার-নিগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি রাজ্যের মানুষের কাছে তো বটেই, ত'ার নিজেরই দলের একটা বড় অংশের কাছে তিনি অপ্রিয় হয়ে যান।

দেখা যাচ্ছে—পশ্চিমবঙ্গের ছ'জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে চারজনই জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারেননি। বাকি থাকে দুটি নাম—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও জ্যোতি বসু। জনপ্রিয়তার দৌড়ে এ দুটি নামই আগে এসে দাঁড়ায়। লক্ষণীয়—ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর। এই দীর্ঘ সময়সীমায় তিনি বহু কল্যাণকর কাজে হাত দিতে পেরেছিলেন। সে তুলনায় জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব মাত্র তিন বছরের। বিধানবাবুর মতো বহুমুখী কল্যাণ-প্রয়াসের নজিরও তিনি এখনো রাখতে পারেননি। তবু জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের প্রশ্নে ত'াকে বিধান রায়ের সঙ্গেই তুলনা করতে হয়; এমন কি এ প্রশ্নও অনেকের মনে উঁকি মারে—কে বেশি জনপ্রিয়, বিধান রায়—না, জ্যোতি বসু?

১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সকাল সোয়া ন'টায় বিধান রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন—তখন ত'ার নেতৃত্ব গ্রহণে কেউই অনাগ্রহী ছিলেন না। ত'ার রাজনীতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন: সত্য ও অহিংসার শিক্ষক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এছাড়া জওহরলালের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব ত'াকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেবার ভিত্তিটি সহজেই তৈরি করে দেয়। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে বিধানচন্দ্র ছিলেন আরো বড়। চিকিৎসক হিসেবে ত'ার খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক। আর এই পেশায় উদারতার মধ্যে দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষেরও কাছে আসতে পেরেছেন। বিধানচন্দ্রের কার্যকালে ত'ার স্থিতিশীল জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ—তিনি ছিলেন কুশলী ও দরদী ডাক্তার।

ডাঃ রায়ের জনপ্রিয়তার একটি বড় প্রমাণ ত'ার জন্মদিন ত'ার কার্যকালেই একটা সাধারণ উৎসবে পরিণত হচ্ছিল। সকাল থেকেই দলে দলে লোক আসতো ত'ার

বাড়িতে ফল ফুল মিষ্টি নিয়ে। এইসব ফল ও মিষ্টি তিনি হাসপাতালের রোগীদের পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৫৯ সালের জন্মদিনে তিনি ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বসতবাড়িটি জাতির উদ্দেশ্যে দান করেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও ডাঃ রায়ের কার্যকাল বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিকল্পনায় চিহ্নিত। লবণ হ্রদ উপনগরী, কল্যাণী উপনগরী, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, দ্বিতীয় হুগলী সেতু, চিত্তরঞ্জন রেল ইনজিন কারখানা, কল্যাণী সুতাকল, হরিণঘাটা দুগ্ধপ্রকল্প, ফরাক্কা ব্যারেজ, ব্যানডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দুর্গাপুরের ইসপাত ও সার কারখানা, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির বঙ্গভবন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি'কে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি বহুবিধ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে বিধান রায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে।

বিধান রায়ের জনপ্রিয়তা তাঁর কীর্তি ও কর্মের মধ্যেই। কিন্তু তাঁর এই কীর্তির গৌরব তিনি তাঁর কার্যকালে অনুভব করতে পারেননি। তার কারণ স্বাধীনতা-উত্তরকালের অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাজনৈতিক আবর্ত।

অপরদিকে জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তার তুলনায় এই তিন বছরে রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তুলনায় অনেক কম। পঞ্চায়েত নির্বাচন, দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, একশো মেগাওয়াটের গ্যাস টারবাইন—এমন গুটি কয়েক অবদান আঙুলে গোনা যায়। মানুষটি সরে যাবার পরও দীর্ঘ দুই দশক জুড়ে বিধান রায়ের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল, এই দুই দশকে রাজ্যের অর্থনীতি ও সাধারণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মন্থরতম অগ্রগতি।

বিধান রায়ের সময়ে যে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিকূলতা ছিল তা হল—(১) স্বাধীনতার পর প্রথম বেশ কয়েক বছর কমিউনিসট পারটি বে-আইনী ছিল। সেদিক থেকে জনতার একাংশ ছিল কংগ্রেস সরকারের ওপর বিরূপ। (২) ১৯৪৯ সালের ৩০ ডিসেমবর বিধান রায় জওহরলালকে একটি চিঠিতে লিখলেন: 'বহুবার আগে তোমাকে লিখেছি, আসল সংকট, বাংলার মানুষকে যা পীড়িত করছে, তা হল খাদ্যের অভাব, চাকরির অভাব এবং উদ্বাস্তুদের জমির অভাব।' (৩) ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন। কলকাতার বুকে পুলিশের হাতে ৮০ জনের মৃত্যু। (৪) রায় মন্ত্রিসভায় দুর্নীতি ও বিশৃংখলার অভিযোগে ১৯৫৮ সালের ৯ মারচ আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পদত্যাগ। দুর্নীতি সম্পর্কে বিধানসভায় সিদ্ধার্থবাবুর ৩০ পাতা বিবৃতি পাঠ। রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা—এই কয়েকটি ঘটনাকে সূত্র ধরে অনুমান করা যায় যে কি পরিস্থিতির মধ্যে বিধান রায়কে টিঁকে থাকতে হচ্ছিল।

জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশটি সর্ব অর্থে সুখকর নয়। যে মুখ্যমন্ত্রীর আমলে গত এক বছরে কলকাতা শহরে ডাকাতি ৩৬, লুঠ ১৬০, দিনে চুরি ১০৬, হত্যা ৯৩, রাতে চুরি ৫৪৪, দাঙ্গা ৪৫৫, ছিটিং ৩৫৬ হয়েছে এবং যে মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ইসলামপুরের অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা বিরল নয়, সেখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রেখেই মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করছেন জ্যোতিবাবু।

রাজ্যে বিদ্যুৎ নেই, কলে জল নেই, গ্রামে পানীয় জল নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, পথে যানবাহন নেই, কলে-কারখানায় উৎপাদন নেই, বেকারের চাকরি নেই, শহরে পায়ে চলার পথ নেই—এত 'নেই নেই'—এর মধ্যে জ্যোতিবাবু কিন্তু বিদ্যুৎ-সি এম ডি এ এসব দপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে 'আছি আছি' করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ যা নিয়ে জনসাধারণের বিরক্তি তাই জ্যোতিবাবুর হাতে; তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবু সবচেয়ে জনপ্রিয়।

জ্যোতিবাবু কি চেহারায় ও অভিব্যক্তিতে রাজনৈতিক উত্তমকুমার? হ্যাঁ মাহাত্ম্য কোথাও একটা আছে। কিন্তু জওহরলালও বিধানবাবুকে বলতেন: 'আমি ঈর্ষা করি তোমার হাইট।' এই হাইট নিয়েও বিধানবাবু যে তাঁর কার্যকালে সকলের প্রিয় হননি, সেকথা ১৯৫৮ সালে নিজেই তাঁর ৭৬তম জন্মদিনের সভায় বলে ফেলেন: 'আমি এই বিরুদ্ধতার মানে বুঝি না; আমিতো কোন অন্যায় করিনি। আমি যখন মরবো তখনই ঐ লোকগুলো বলবে, লোকটা ভাল ছিল গো, আরো কিছুদিন বাঁচলে পারতো।'

এই সম্মান আজ জ্যোতিবাবুর সরকারও তাঁকে দিচ্ছেন। কলকাতায় মহাকরণের সামনে বিধান রায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এই সরকারের আমলেই। মহাকরণে কয়েকজন মন্ত্রীর ঘরেও বিধানবাবুর ছবি রয়েছে। গত বছরে উত্তর কলকাতায় একটি ওষুধ কোমপানির চত্বরে বিধান রায়ের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন শিল্পমন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্য। বিধান রায়ের জন্মদিনটি এখনও এ রাজ্যে সাড়ম্বরেই পালিত হয়।

তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেন? ১৯৭৮ সালে রাজ্যজুড়ে অভূতপূর্ব বন্যা, দণ্ডকারণ্য থেকে প্রায় একলক্ষ বাঙালীর এ রাজ্যে আগমন এবং আসাম থেকে এখনও বাঙালী আগমনের স্রোত সামলাতে পেরেছেন ও পারছেন বলেই কি জনসাধারণের মন জয় করতে পেরেছেন? না-কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের সরাসরি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেই কি জনসাধারণ জ্যোতিবাবুর ওপর সবচেয়ে বেশি খুশী?—বলাবাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এর প্রতিটি কাজেই জ্যোতিবাবুর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এসব কোন ঘটনাকেই বিরোধীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে ছাড়ছেন না। এ ব্যাপারে তারা বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করছেন, তবুও কোন ফল হচ্ছে না। জ্যোতিবাবু প্রায়ই বলেন: আমরা কারো দয়ায় সরকার চালাচ্ছি না। রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ আমাদেরই পক্ষে। এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় যখন বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে দুসপ্তাহ 'কেরোচিন' তেল না পৌঁছোলেও মন্মথ গড়াই নামে এক গ্রামবাসী বলে ওঠে: জ্যোতিবাবু যখন আছে, যে করেই হোক সুরাহা

হিটলার-স্তালিন বিতর্ক

১৯৫৩ সালের ১০ নভেম্বর। বিধানসভায় নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের সপ্তম ধারা অনুসারে পুলিশ গণনাট্য সংঘের কাছে ৫৯খানি নাটকের পাণ্ডুলিপি চেয়ে পাঠায়। তার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখাও ছিল। জ্যোতিবাবু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান—আর কোনো নাট্য সংস্থার কাছে এরকম নাটকের কপি চাওয়া হয়েছে কিনা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন: গণনাট্য সংঘ কমিউনিসটদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা নাটকের রদবদল করে থাকেন।

জ্যোতি বসু: কোন নাটকটা তারা বদলিয়েছে?

মুখ্যমন্ত্রী বলব না।

জ্যোতি বসু: কেন বলবেন না?

মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু বলা যায় না।

জ্যোতি বসু: আইন সভায় এ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবার রীতি নেই। আপনি খুদে হিটলারের মতো আচরণ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ। হিটলার স্তালিনের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

এড়া করবেনই।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, তাঁর জনপ্রিয়তার ভিত তৈরি হয়েছে বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবেই। কালের কষ্টিপাথরে ঘা খেয়ে জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক জীবনটি তৈরি হয়েছে। যখন তিনি মানুষের জন্য কার্যত নিজের হাতে কিছু করেননি, আন্দোলন ও মর্মবেদনা প্রকাশই ছিল তাঁর একমাত্র অস্ত্র তখনই মানুষ তাঁকে অনেক বেশি কাছের করে নেবার সুযোগ পেয়েছেন।

অপরদিকে বিধানবাবু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনই বিরোধী দলের আসনে বসেননি। সমালোচনা সরকারের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে, বরাবরই জনসমর্থন পায় বিরোধীরা কিন্তু জ্যোতিবাবু তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্যে বিরোধী নেতা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবেও দিনে দিনে এত বেশি জনসমর্থন পেয়েছেন যে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনে বসিয়ে মাত্র তিন বছরে তা ম্লান করে দেওয়া শক্ত।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন জ্যোতি বসুর চাইতে ৩২ বছরের বড়। বিধানচন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন ১৯২৩ সালে। সে বছর দেশবন্ধুর সাহায্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে পরাজিত করে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। আর জ্যোতি বসুর রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯৩৫ সালে। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। সুতরাং জ্যোতিবাবু বয়সে পেছিয়ে থাকলেও বিধান রায়ের চাইতে অনেক দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছে।

একমাত্র ১৯৭২ সাল ছাড়া প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে জ্যোতিবাবু একটানা জিতে আসছেন। এই নির্বাচনগুলিতে তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার দিয়ে তাঁর জনসমর্থন বৃদ্ধির বহরটা বোঝা যাবে। জ্যোতিবাবু ভোট পেয়েছেন ১৯৫২ সালে ১৩,৯৬৮; ১৯৫৭ সালে ২৮,২৬৯; ১৯৬২ সালে ৪০,৮৩০; ১৯৬৭ সালে ৩১,৩৫৪; ১৯৬৯ সালে ৪৩,৩৪০; ১৯৭৭ সালে ৪৫,৫৩৮। বিতর্কিত ১৯৭২ সালের নির্বাচনে অবশ্য ৩৮ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরেছেন।

পাশাপাশি বিধানবাবুর নির্বাচনে জয় ছিল হতাশার মধ্যে এক ফোঁটা আলোর বিন্দু। ১৯৫২ সালে বউবাজার কেন্দ্রে তিনি মাত্র ৪১১১ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিসট) প্রার্থী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিবাবু সেবার জিতেছিলেন ৫ হাজারেরও বেশি ভোটে। ১৯৫৭ সালে সি পি আই-এর মহম্মদ ইসমাইলের বিরুদ্ধে বিধানবাবু জিতেছেন মাত্র ৫৪০ ভোটে। জ্যোতিবাবু জিতেছেন ১০ হাজার ভোটে। অথচ ঐ বছরেই প্রফুল্ল সেন দুটি কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ৩২ হাজার ও ২৮ হাজার ভোটে জিতে গেছেন। বিধানবাবু সেদিন বলেছিলেন—মহম্মদ ইসমাইল একজন অপরিচিত প্রার্থী, সুতরাং তাঁর জয় সহজ হবে। আবার ১৯৬২ সালে বিধানবাবু চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ২২ হাজার ৫০০ ভোট পেয়ে জিতলেও, ঐ বছরেই বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্রে তিনি জয়লাভ করেছেন মাত্র ৬,০২০ ভোটে। অথচ জ্যোতিবাবু পেয়েছিলেন ৪০,৮৩০ ভোট। বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বিধান রায়ের ভোটের ব্যবধান দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গ্রামাঞ্চলে তাঁর তেমন কোন প্রভাব ছিল না। জ্যোতিবাবু কিন্তু শহর গ্রাম দু'এলাকাতেই সমান জনপ্রিয়। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হবার পর জ্যোতিবাবু এখনও কোন নির্বাচনী পরীক্ষা দেননি—এটাও স্মরণে রাখা দরকার।

বিধান রায় তাঁর শাসনকালে কেন্দ্রেও যে একই দলের সরকার পেয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জহরলালের মতো বন্ধুও পেয়েছিলেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু জনতা দলকে বন্ধু হিসাবে ভাবলেও, সব সময়ে বন্ধুর আচরণ পাননি, এমনকি পরবর্তীকালে কংগ্রেস (ই) দলের মতো কেন্দ্রে হুমকী দেবার সরকারও এসে গেছে। ভূমি সংস্কারের মতো যে কাজের মাধ্যমে জ্যোতিবাবু গ্রামীণ ভিত্তি সুদৃঢ় করতে চান, বিরোধীরা তাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেন না। বিধানবাবুর আমলে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির জন্য (১৯৫৩ জুলাই) কলকাতার বুকে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেতে পারে; কিন্তু আজকের দিনের মতো স্থায়ী প্রতিকূলতা তাঁর সামনে ছিলনা।

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যতটা তার চেয়ে বেশি সম্মান বিধান রায় পেয়েছেন চিকিৎসক হিসেবে। কিন্তু কমিউনিসট নেতা বলেই জ্যোতিবাবুর খ্যাতি সব দেশে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান, মসকো অলিমপিকে যাবার ডাক আসে। কিন্তু ঘরের পাশে ত্রিপুরায় ঐ একই দলের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এ নিমন্ত্রণ পান না। বরং ত্রিপুরায় উপজাতি সংঘর্ষ হলে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নৃপেনবাবু জ্যোতিবাবুকে তদ্বির করতে বলেন। এর কারণ হল জ্যোতিবাবুর ইমপ্রেস করার মতো পারসোনালিটি বিশেষ ফলপ্রসূ।

বিধান রায়কে কিন্তু কোনদিন ফ্রন্ট সরকারের মতো একাধিক ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মন্ত্রীদের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়নি। জ্যোতিবাবুকে করতে হচ্ছে এবং তিনি তা সাফল্যের সঙ্গেই করছেন। দলকে সইতে পারেন না, দলের অন্যান্য নেতাদেরও হয়তো সইতে পারেন না—কিন্তু জ্যোতিবাবুকে সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন। যেমন মৎস্যমন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল ফ্রন্ট কমিটিতে প্রমোদ দাশগুপ্তর সমালোচনাকে উপেক্ষা করে বলতে পারেন: আমি জানি আমার শুধু দুই নেতা। নিজের দলে ফরোয়ারড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ এবং সরকারী ক্ষেত্রে জ্যোতি বসু। এই মনোভাব অন্যান্য দলের মন্ত্রীদেরও।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিরোধিতা করলেও বিরোধী নেতাদেরও কিন্তু জ্যোতিবাবুর ওপর একটা সুপ্ত শ্রদ্ধা রয়েছে। এমনকি বিধানসভাতেও জ্যোতিবাবুর ভাষণের সময় বিরোধী সদস্যরা নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করেন।

দলের হয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পেরেছেন বলে শোনা যায় না—এমন কি বিধান রায়ও নন। কিন্তু জ্যোতি বসুর আবেদন অন্য রাজ্যেও সমান। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকেও তিনি জাতীয় নেতার স্তরে পৌঁছে গেছেন। জ্যোতিবাবু ডাক্তার না হতে পারলেও তাঁর ব্যারিসটার হবার সুযোগ ছিল, কিন্তু সে পথে না গিয়ে আজীবন রাজনীতির মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই জনপ্রিয় হয়েছেন। বিরোধী নেতা হিসেবে জ্যোতিবাবু হাজার হাজার প্রশ্ন তুলেছেন, সভা সমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন, আর বিধানবাবু সে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন, উত্তেজিত মানুষকে শান্ত করেছেন—সেখানে সুভাষণের কৌশলটি জ্যোতিবাবুকেই আয়ত্ত করতে হয়েছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সে কৌশল তাঁর কাছে আশীর্বাদ।

প্রয়াত ব্যক্তির জনপ্রিয়তা চূর্ণ করা বা ছিনিয়ে নেওয়া মুশকিল, কিন্তু জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তা কি স্থায়ী হবে? সেটা নির্ভর করে তাঁর নিজের ওপর। মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েও তিনি পর্ষদ ইনজিনীয়ারদের নিন্দে করেন সি ই এস সির অনুষ্ঠানে, বিদ্যুৎ কর্মীদের সভায় তিনি নিজের দলের লোকদের ঠিকমত কাজ না করার জন্য তিরস্কার করেন, আবার সিটুর রাজ্য সম্মেলনে তিনি বলে ওঠেন—শ্রমিকরা ঠিকই কাজ করেন, মালিকরা তাদের প্রাপ্য দেন না; অথবা গ্রামে যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে বিড়লার পরামর্শে ডিজনিল্যানডের স্বপ্ন দেখেন যে মারকসবাদী মুখ্যমন্ত্রী—তাতে তাঁর জনপ্রিয়তায় সাময়িক টোল পড়তে পারে; কিন্তু কিছু কাজ ও কথার যাদুদণ্ডে জনমনের যে কোন ক্ষোভকে বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন রাজনীতির যাদুকর জ্যোতি বসু। ★

আলোকচিত্র ঃ আশোক ব

অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল—
নিপীড়িত মানুষের আশার আলো



লনডনের কভেন্ট গারডেন আর স্ট্রানডের মাঝখানে এক মস্ত বাড়ির চারটে তলা নিয়ে অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনালের সদর দপ্তর। এরই একটা ঘরে অ্যামনেসটির প্রেস অ্যাটাশে মিস ফ্যান টেলরের অফিস। এক সকালে তাঁর টেবিলে এসে পৌঁছল একটা খাম। ওপরে স্ট্যাম্প ও পোসট অফিসের মার্কা দেখে বোঝা গেল খামটি এসেছে বহু পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর উরুগুয়ে থেকে। টেলর খাম খুলতে বেরল একটা চিঠি আর কিছু ছবি। তিনি চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর ফরসা মুখ হল রাঙা, হালকা রঙিন কাচের চশমার পেছনে তাঁর ঈষৎ নীল চোখে জ্বলে উঠল আগুন। চিঠিখানা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই রকম :

'আমি উরুগুয়ে সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার। এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি শুধু একটাই কারণে। তা হল, দিনের পর দিন বীভৎস সব কর্মকাণ্ড দেখার ও কখনো কখনো সেই সমস্ত কাজে যোগ দেওয়ার অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে পাগল করে তুলেছে। এতদিন আমার জীবনে যা ছিল মূল বিষয়—আমার পরিবার, চাকরি, জীবন, আমার দেশ—সর্বকিছু সম্বন্ধেই আমার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

'আমি জানি আমি এক দারুণ ঝুঁকি নিচ্ছি। আমার সহকর্মী অফিসারদের প্রতি করছি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু আমার ধর্মবিশ্বাস ও মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এ সব কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে।

'আমি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম দুটো ফটোগ্রাফ যেগুলো তোলা হয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর বাড়িগুলোতে যেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সেই সঙ্গে অত্যাচার করা হয়। এখানে দু'ধরনের অত্যাচার পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে। একটির নাম 'ব্যানার' অপরটির নাম 'শ হর্স'। 'ব্যানার' পদ্ধতিতে বন্দীকে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়সেরও বেশি কড়া রোদে হাত দুটি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। 'শ' হর্স হল মাটি থেকে বেশ উঁচুতে আড়াআড়িভাবে বসানো একটি লোহার ডাণ্ডা। বন্দীকে উলঙ্গ অবস্থায় ঐ ডাণ্ডার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়; আর পা দু'টি ঝুলতে থাকে শূন্যে। এর ফলে শরীরের সমস্ত ওজন এসে পড়ে তার যৌনাঙ্গের ওপর। আরও ভয়ঙ্কর অত্যাচার পদ্ধতি আছে; বীভৎস তাদের নাম। 'সাবমেরিন' পদ্ধতিতে বন্দীর মাথা এক গামলা জলে ডুবিয়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করা হয়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দিনের পর দিন উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়। ঐ অবস্থাতেই তাদের সমস্ত দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে হয়। এছাড়া ইলেকট্রিকের ব্যবহারও আছে প্রচণ্ড। দু'কানের লতিতে বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে চার্জ করার নাম 'টেলিফোন'।

'কোন মেয়ের আগমনে অফিসাররা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করে। কেউ কেউ তাদের ছুটির দিনেও চলে আসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। মেয়েদের উপর নির্মম অত্যাচারের কিছু দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে।

অনিত সান্তারা

এদের বেশির ভাগেরই বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। শুধুমাত্র এদের স্বামী, ছেলে, বাবা বা ভাই-এর খবর জানার জন্যেই গ্রেপ্তার করা হয়।

'এই চিঠি দীর্ঘতর হতে পারে কিন্তু এখানে আমি যা বর্ণনা করেছি তা উৎকণ্ঠা ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আমি জানি এই ঘটনা সারা দেশেই ঘটছে। যে সমস্ত বাড়িতে বন্দীদের অত্যাচার করা হয় সেই ধরনের একটা বাড়ি আছে ৫৫১৫ নং ও' হিগিনস ড্রাইভে। প্রতিবেশীরা সাক্ষী দেবে বন্দীদের চিৎকারের শব্দ তারা দিনরাত শুনতে পায়। উদ্দাম বাজনার শব্দও তাকে ঢাকতে পারে না।

'এই চিঠি আমি লিখছি এই আশায় যে কেউ যদি আমাদের দুঃস্বপ্ন থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে।'

মানুষের প্রতি মানুষের বীভৎস নারকীয় আচরণের এমন সব কাহিনী রোজই এসে জমা হয় ফ্যান টেলরের টেবিলে। কোনটায় থাকে আর্জেন্টিনায় কমিউনিসট সন্দেহে এক সন্তানসম্ভবা তরুণীর উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী; কোনটায় থাকে সাইবেরিয়ায় সরকার-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের অসহ্য জীবনের বর্ণনা, কোনটায় বা থাকে দক্ষিণ আফরিকায় কালো মানুষদের ব্যাপক ধরপাকড়ের খবর। এই সব চিঠি, রিপোরট এবং ছবি আসে বন্দী অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন, সাংবাদিক বা বিবেকতাড়িত পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে জেলের উঁচু পাঁচিল টপকে, চোরাই পথে দেশের সীমানা পেরিয়ে। অনেকেই তাদের জীবনের পরোয়া না করেই পাঠান এই সব রিপোরট। ধরা পড়লে এই 'চোরাই চালানের' শাস্তি অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ড। অ্যামনেসটির অফিসে কোন চিঠি বা রিপোর্টই ফাইল বন্দী হয়ে ধুলো জমায় না। এদের যথাবিহিত ব্যবস্থা অ্যামনেসটি বেশ দ্রুতই করে।

পিটার বেনেনসো নামে একজন ইংরেজ আইনজীবী স্পেন, হাঙ্গেরী এবং দক্ষিণ আফরিকায় রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে ডিফেনস কাউনসেল হিসেবে মামলা চালিয়ে বেশ নাম করেছিলেন। ১৯৬১ সালে গ্রীষ্মের এক সকালে তিনি কাগজের এককোণে ছাপা এক টুকরো খবর পড়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। পর্তুগালের এক শহরের রাস্তায় একদল ছাত্র গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য ও উন্নতি কামনা করে মদ্যপান করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং এই অপরাধে তাদের কয়েক বছর জেল হয়। বেনেনসো তখন পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' চালানোর জন্য পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী ও অধিকার-সচেতন মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে দুটো প্রবন্ধ লেখেন। দুটো প্রবন্ধের একটা ছাপা হয় লনডনের 'অবজারভারে', অপরটি প্যারিসের 'লে মনডে'-তে। প্রবন্ধদুটি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। এদেরই অনুপ্রেরণায় এবং প্রচেষ্টায় প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় দুমাসের মধ্যে অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা হয়। জন্মের সেই মুহূর্তটি থেকে আজ পর্যন্ত অ্যামনেসটি দেশ, জাতি, মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। আজ আর এটা একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়। অ্যামনেসটি পৃথিবীব্যাপী একটা আন্দোলনের সূচনা করেছে—স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বর্তমানে এর সভ্য সংখ্যা প্রায় ১,৬৮,০০০। তারা ১০৭টি দেশে ছড়িয়ে আছেন।

অ্যামনেসটির হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর জেলখানাগুলোতে আছে প্রায় পঞ্চাশ লাখেরও বেশি রাজনৈতিক বন্দী। এই হিসেব থেকে অবশ্য সহিংস আন্দোলনপন্থীরা বাদ পড়েছেন। অ্যামনেসটি কেবলমাত্র অহিংস-পন্থীদের কথাই চিন্তা করে। এদের নামকরণ করা হয়েছে 'বিবেকযুক্ত বন্দী'। লনডনের সদর দপ্তরে প্রতিদিন যে সমস্ত বন্দীদের চিঠি, প্রেস রিপোরট, ছবি ইত্যাদি এসে পৌঁছয় সেগুলোকে দেশ অনুযায়ী বাছাই করে এক একটি দেশের ওপর বিশেষজ্ঞ 'রিসার্চারের' কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিচার হয়ে থাকলে আদালতের রায়, প্রেস নোট, বন্দীর চিঠি ইত্যাদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে স্থির করেন বন্দী 'বিবেকযুক্ত বন্দী' কিনা। পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হলে বন্দীর কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় অ্যামনেসটির বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ২০০০ 'অ্যাডপশন গ্রুপ'গুলোর মধ্যে যে কোন একটাতে। 'অ্যাডপশন গ্রুপ' তখন অভিযুক্তের মুক্তির আবেদন জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে টেলিগ্রাম, চিঠি ইত্যাদি পাঠাতে থাকে। এরপর ঐ সরকারের কীর্তিকলাপ ফাঁস করে প্রেস নোট তৈরি করা হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী এক শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। অনেক সময় বৃহৎশক্তিধর দেশগুলো কিংবা জাতিসংঘ জনমতের চাপে বাধ্য হয় ঐ সরকারের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বন্দীকে মুক্ত করে আনতে। এই ধরনের প্রচার একটানা চার পাঁচ বছর চলতে পারে যতদিন না বন্দী মুক্তি লাভ করেন অথবা প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

অ্যামনেসটির হাতে একমাত্র হাতিয়ার হল প্রচার। তাই মনে হতে পারে—এরা যেন পালক দিয়ে পাথরকে আঘাত করছেন। কিন্তু অতীতে বহু কুখ্যাত শাসকই অ্যামনেসটির কার্যকলাপে বিশেষ অসুবিধায় পড়েছেন। এদের মধ্যে আছেন ইরানের প্রাক্তন শাহ রেজা পহ্লবি, উগানডার প্রাক্তন প্রেসিডেনট দাদা আমিন। ইরানের গেসটাপো বাহিনী 'সাভাক'দের কার্যকলাপ, আমিনের উগানডায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি, ইনদোনেশিয়ার জেলে ৫৫,০০০ রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃসহ জীবন ইত্যাদির বিবরণ অ্যামনেসটিই প্রথম প্রকাশ করে। তিন বছর আগেকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অ্যামনেসটির উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। আজও এল সালভাদর, গুয়াটেমালা, আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশের মানুষদের জীবন সম্বন্ধে অ্যামনেসটি চিন্তিত।

অ্যামনেসটির যারা প্রাণ সেই সব 'রিসার্চাররা' সবাই চটপটে স্বভাবের তরুণ-তরুণী। তাদের বয়স কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রবীণের সংখ্যা খুবই কম। বিশ্বে আর কোন প্রতিষ্ঠানেই এত বড় দায়িত্ব তরুণ তরুণীরা বহন করে না। প্রত্যেককেই একসঙ্গে প্রায় এক'শ বন্দীর খবরাখবর নিতে হয়। প্রতিদিনই গড়ে প্রায় দশটা করে নতুন রিপোর্ট এসে পৌঁছয়। দিনের পর দিন এই সব বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী পড়া ও বহু মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনের ওপর চাপ পড়ে প্রচণ্ড। তাই কেউ এখানে বেশিদিন কাজ করতে পারে না; অথচ বেতন ও অন্যান্য ভাতা বেশ ভালই। তরুণ রিসার্চারদের বেশিরভাগই আইনের স্নাতক। বিভিন্ন দেশ থেকে তারা অ্যামনেসটিতে এসে যোগ দিয়েছে। তাদের ভাষা বিভিন্ন হলেও তারা একাধিক ভাষায় কথাবার্তা চালাতে পারে।

এমনই একজন 'রিসার্চার' হল আরজেনটিনা বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিসিয়া ফিনে। আরজেনটিনায় সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে সেখানে এক ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। মিলিটারি পুলিশ কমিউনিসট গেরিলাদের আড্ডা ভাঙার নামে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালিয়ে নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে আর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কালো চুল-ওয়ালা হাসিখুশি স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে প্যাট্রিসিয়া ফিনে রোজ রাত্রে ঘুমোতে যায় এই সব হারিয়ে যাওয়া মানুষদের চিন্তা মাথায় নিয়ে। ১৯৭৬-এ ফিনে গিয়েছিল আরজেনটিনায় সরেজমিন তদন্তে। সঙ্গে ছিলেন ব্রিটেনের লর্ড আভেবারি আর আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য ফাদার রবার্ট ড্রিনান। প্যাট্রিসিয়া তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন: রাত্রে গিয়ে পৌঁছলাম বুয়েনস আয়ারসে। হোটেলে গিয়ে দেখি লবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল স্যুট আর কালো চশমা পরা বেশ কিছু লোক। ওরা যে সবাই গোয়েন্দা আর আমাদেরই ওপর নজর রাখছে তা আর বলে দিতে হল না। হঠাৎ একজন ছুটে এসে কিছু না বলেই ফাদার ড্রিনানের একটা ছবি তুলল। আগে অনেক রিপোর্টে পড়েছিলাম এই ধরনের গোয়েন্দা পুলিশরাই নৃশংস কাজে লিপ্ত আছে। ভগবানই জানেন সেদিন ওদের মতলব কী ছিল। পরেরদিন থেকে শুরু হল হয়রানি। করডবা শহরে আমাদের গাড়ি প্রায় তিরিশজন লোক ঘিরে ধরে এবং নানাভাবে শাসাতে থাকে। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে আমার যাবতীয় কাগজপত্র ও চিঠি ফাদার ড্রিনানের কাছে রেখে দিয়েছিলাম লনডনে পৌঁছে দিতে। যদি আমি না ফিরি!'

প্যাট্রিসিয়া নিরাপদে লনডনে ফিরেছিলেন। ফিরে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা মানুষের প্রতি মানুষের জঘন্যতম বর্বরতার নিদর্শন হতে পারে। ঝরঝরে ইংরেজিতে লেখা ঐ রিপোর্টে আছে ২৬ বছর বয়সী এক যুবতী স্কুল শিক্ষিকার কথা, যাকে কমিউনিসট সন্দেহে মিলিটারি পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের সময় সে ছিল সন্তানসম্ভবা। মিলিটারি ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। তার কানে, বুকে, তলপেটে বৈদ্যুতিক রড লাগিয়ে চার্জ করা হয়। পরে তার আর কোন হদিস পাওয়া যায় না। এর পর এক সময় তার স্বামীও নিখোঁজ হয়। তারপর এক ভোর রাত্রে পুলিশ গিয়ে হানা দেয় ঐ মহিলার বোনের বাড়িতে। খানা-তল্লাসীর পর পুলিশ বোন ও ভগ্নীপতি উভয়কেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে প্রতিবেশীরা ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখতে পায় জিনিসপত্র চারিদিকে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে আছে আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে দু'টো শিশু। জামায় তাদের দাদু-দিদিমার ঠিকানা আঁটা। ওদের বাবা-মা আর কোনদিনই ফিরে আসেনি।

ঐ রিপোর্টে কারলোস নামে আর একজন যুবকের বর্ণনা আছে। তাকে প্রথমে রড দিয়ে প্রচণ্ড পেটানো হয়, তারপর তার ক্ষতস্থানগুলো ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে চেরা হতে থাকে। এ ছাড়াও আছে হাতের বা পায়ের নখের নীচে পিন ঢুকিয়ে দেওয়া বা নখ টেনে উপড়ে আনার ঘটনা। বন্দীর মৃত্যু হলে মৃতদেহ মাটিতে চুন মিশিয়ে কবর দেওয়া হয় অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনালকে। এই পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে যে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া হয় তার থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা জন্মায়। কমিউনিসট রুশ সরকারের মুখপাত্র এ সম্বন্ধে বলেন, 'এ হল (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে) পশ্চিমী দুনিয়ার আর একটা ষড়যন্ত্র।' অপরদিকে ইনদোনেশিয়ার কমিউনিসট বিরোধী সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান এডমিরাল সোডোমো ঠাট্টা করে এর নাম দেন 'অ্যামনেসটি কমিউনিসট ইনটারন্যাশনাল।' উগানডার একজন মন্ত্রী বলেন—'এই পুরস্কার হল বদ রসিকতা।'

আগে বহুবারই নোবেল পুরস্কার অনেক অপাত্রেই দান করা হয়েছে। এর জন্য পুরস্কার কমিটিকে কম সমালোচনা শুনতে হয়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে যতই বিদ্রূপবাণ শানাক না কেন, সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একে স্বাগত জানাবে। কারণ এই পুরস্কার সব রকম স্বেচ্ছাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতারই স্বীকৃতি। ★

ছবি এঁকেছেন: জি সান্তা

বাজ যাঁকে আলো ফিরিয়ে দিয়েছে

বিশ্বজিৎ সিংহ

৭ জুন, ১৯৮০। রাত পৌনে ন'টা।

উত্তর কলকাতার বরানগরের এক দোতলা বাড়ি।

নিচতলায় মাঝের ঘরে জানলার পাশে বিছানায় ঈষৎ গা এলিয়ে বসে আছেন অন্ধ গৃহকর্তা। ৯৪ বছরের বৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথ রাহা। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। হঠাৎ আকাশ কাঁপানো বিকট শব্দ। বাজের। শ্রীরাহা কেঁপে ওঠেন। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। তিন চার মিনিটের রেশ। এরপর উনি রাতের খাওয়া সারেন। রেডিওতে সংবাদ শুনে সওয়া দশটায় শুয়ে পড়েন।

পরদিন ভোর পাঁচটা। ঘুম ভাঙতেই উপেনবাবু চমকে উঠলেন। এ কী, তিনি যে দেখতে পাচ্ছেন। ঝাপসা ঝাপসা। বিছানায় সবুজ চাদর। অবিশ্বাস্য, রং। বাইরের দিকে তাকান। পাশের হলদে দেওয়াল। উপেনবাবু বুঝতে পারেন, তিনি জেগেই আছেন।

পাশের খাটে শুয়ে ছিলেন ৮৪ বছরের বৃদ্ধা স্ত্রী চারুবালা দেবী। ডাকেন। বলেন: চারু, আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমাকেও। বিস্মিতা স্ত্রীকে আরো অবাক করে শ্রীরাহা বলে উঠেন: তোমার চুল দেখছি ক'বছরে সব সাদা।

রাহা বাড়িতে তৎক্ষণে খবর চাউর। ছেলেরা সকলে ছুটে এসে হাজির। কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না, বাবা আবার দেখতে পাচ্ছেন। মধ্যম পুত্রবধূ শিবানী দেবী হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে জানতে চান: বাবা, বলুন তো ক'টা। উপেনবাবু সঠিক জবাব দেন। উনি বলে যেতে থাকেন কে কী শাড়ি পড়েছে কার জামার রং কী রকম।

যত সময় যায়, দৃষ্টিশক্তি আরো প্রখর হতে থাকে। হাতের কাছে বই পেয়ে বড় ছেলে তাই তুলে ধরেন। শ্রীরাহা চোখ বুলিয়েই বলে দেন: নাম—তৃতীয় দুনিয়া। বাড়ির সবাই এবার বুঝতে পারেন, উপেনবাবু আর অন্ধ নন। বজ্রের আশীর্বাদে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। বড় ছেলে মেজ ছেলে ড্রইং রুমে বসে ঠিক করে ফেলেন: এ অলৌকিক ঘটনা কাউকে বলা হবে না। আগে ক'দিন যাক।

উপেনবাবুর জন্ম ওপার বাঙলায়। হাইট পাঁচ ফুট পাঁচ ইনচি। গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা। মুখে কয়েক গোছা সাদা দাড়ি। মাথায় চুল কম। ১৯৪৬ সালে বরিশালে পুলিশের ইনেসপেকটার হিসাবে চাকরি থেকে অবসর নেন। সরকারি কাজে কৃতিত্বের জন্য পুলিশ মেডেলও পান। শ্রীরাহা কলকাতায় বরানগরে মহারাজা নন্দকুমার রোডে বাড়ি করেন।

তিনি জীবনে প্রথম চশমা নেন ১৯৩৭-৩৮ সালে। ফর রিডিং পারপাস। পাওয়ার চেনজ করতে হয়নি। প্রথম ছানি টের পাওয়া যায় ৫৮ সালে। চার বছর বাদে দু'চোখেই ছানি ম্যাচিওর করে। ডাঃ নীহার মুনসী আর জি কর হাসপাতালে প্রথম ছানি অপারেশন করেন বাঁ চোখে। বলেন, ৬ মাস পর ডান চোখেও করতে হবে। বয়স তখন ৭৬। দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে কিনা ডাক্তারদেরও সন্দেহ ছিল। কিন্তু উপেনবাবু বাঁ চোখে প্লাস ১১ চশমা লাগিয়ে ভালই দেখতে পেতেন। ডান চোখে আর অপারেশন করাননি। ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে তিনি বাঁ চোখে ঝাপসা দেখতে থাকেন। বছরের শেষে পুরো অন্ধ হয়ে যান।

অন্ধ হবার পর উপেনবাবু আর ঘর ছাড়া হননি। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল রেডিও। সংবাদ হলেই তিনি শুনতেন। ভোর থেকে রাত। বাড়ির লোকেরা তাঁকে পালা করে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন। ছকে বাঁধা জীবন।

চোখ ফিরে পেয়ে তাঁর যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। শ্রীরাহা চান ঘুরে বেড়াতে, সব দেখতে। বললেন: আমার ১০০ বছরের বেশি বাঁচতে ইচ্ছে করছে। আমার বাবা ১০৭ বছর বেঁচে ছিলেন। দু'চোখেই পুরো দেখতে পেতেন।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার পর একদিন বড় ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা কী কী। উনি জবাব দেন: ১) আত্মীয় স্বজনদের আসতে বলো। ২) টেলিভিশন দেখবো। ৩) কলকাতা ঘুরবো।

বছর তিনেক আগে উপেনবাবুর আদরের ছোট নাতনীর বিয়ে হয় সমারোহে। নাতজামাইকে তাঁর দেখা হয়নি। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার দিনই তিনি স্ত্রীকে বলেন: ওদের খবর দাও। তাঁর এক প্রপৌত্রও আছে। ভানজানিয়ায়। তাকেও কোলে তুলে দু'চোখ ভরে দেখতে চান।

আপনজনদের আবার দেখতে পাবার আনন্দে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার উপেনবাবুর দু'চোখ বেয়ে এখন টপটপ করে জল পড়ে। তাঁর পরিবারের ছবি বর্তমানে এই: স্ত্রী, ৩ পুত্র, ১ পুত্রবধূ, ২ কন্যা, ১২ পৌত্র, ৫ প্রপৌত্র। এবছর জামাইষষ্ঠীতে এদের অনেকেই উপেনবাবুকে ঘিরে মিলনোৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

টেলিভিশন থেকে শ্রীরাহার ছবি নেওয়া হয়। বাড়ির লোকেরা ঠিক করেছিলেন, ওদের বাবা জীবনে প্রথম টেলিভিশন দেখবেন যেদিন ঐ ছবি দেখানো হবে। কিন্তু লোডশেডিংয়ের দরুন তা সম্ভব হয়নি।

উপেনবাবুর জীবনের এই অলৌকিক ঘটনা দিন বারো বাইরের কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। শ্রীরাহার ছোট জামাই নারায়ণ দাঁ কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের বোম স্কোয়াডের ও সি। তিনিই এক সন্ধ্যার লালবাজারে কথায় কথায় দুই রিপোরটারকে বলে ফেলেন।

খবরের কাগজে সে কাহিনী প্রকাশিত হতেই চারদিকে কৌতূহল। নিত্যদিন কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে উৎসুক মানুষরা ভিড় করেন রাহা বাড়িতে। উপেনবাবু তাদের সামনে বসে বলে যান, কার জামার রং কী, কার চোখে চশমা, এসব। এক ব্রহ্মচারীও এসেছিলেন উপেনবাবুকে দেখে পুণ্যার্জন করতে।

কিন্তু একমাসের মধ্যে কোন চক্ষু চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেননি। বজ্রের স্পর্শে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার ঘটনা ভারতে নেই। বিদেশেও বিরল প্রায়। অনেকেই মনে করছেন, উপেনবাবুর ঘটনা শক থেরাপি নয়, সাউনড থেরাপি। একে নিয়ে পরীক্ষা করলে স্নায়ু ও চক্ষু বিশেষজ্ঞরা নতুন দিগন্তের আভাস পেতে পারেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য মহাকরণে এই প্রতিবেদককে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন: এ মুহূর্তে কোন মেডিকেল টিম করছি না। রিজিওনাল ইনসটিটিউট অব অপথালমলজির ডিরেকটারকে বলেছি রিপোরট দিতে। সেটা আগে দেখি।

উপেনবাবুকে নিয়ে গবেষণায় পরিবারের লোকদের আপত্তি নেই। ওরা বরং এটাই চান। কিন্তু আর তারা অপেক্ষা করতে নারাজ। নিজেরা কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে ডাকবেন। উপেনবাবুকে দেখাবেন। ★

বিদেশী দোসর

পোরটল্যানড, ইউ. এস. এ.।

বাষট্টি বছরের এডুইন রবিনসন বলেছেন: আমি যেন আগামী পঞ্চাশ বছর পরিপূর্ণভাবে বাঁচার রসদ পেয়েছি।

রবিনসন ছিলেন একজন ট্রাক ড্রাইভার। ন'বছর আগে এক দুর্ঘটনায় তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে যান।

কিছুদিন আগে রবিনসন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎই মেঘ জমলো আকাশে, হাওয়া বইলো শোঁ শোঁ…দু এক ফোঁটা বৃষ্টি, আর তখনই কড় কড় করে মেঘ চিরে আলোর ঝলক…

ঘোর কেটে যেতে রবিনসন দেখলেন, তাঁর অন্ধত্ব ঘুচে গেছে, তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন; শুনতে পাচ্ছেন বাতাসের শোঁ শোঁ, মানুষজনের কথাবার্তা—অর্থাৎ আর তিনি বধির নন

আর…আর…তরুণ দিনের মত তাঁর মাথার সব চুল কুচকুচে কালো!

বিশ্ববিচিত্রা

ঘুমের খেসারত

পাঠাগারে ঘুমোনো চলবে না। আইন ভাঙলে প্রথমে একবার সাবধান করে দেওয়া হবে। তারপরেই নিয়ম ভাঙার শাস্তি ২০ পাউন্ড জরিমানা। আইনটি চালু করেছেন বার্কশায়ার গ্রাম্য-পাঠাগারের কর্মকর্তারা। নাক-ডাকা ঘুমকাতুরে এক শ্রেণীর সভ্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন মনোযোগী পাঠকরাই।

সমকামী প্রতিবাদ

সানফ্রানসিসকোর এক প্রেক্ষাগৃহে একটি ছবির মুক্তির দিনটিতেই হঠাৎ কয়েকশো লোকের এক প্রতিবাদ-মিছিল। তাদের বক্তব্য: ছবিটির বিষয় সমকাম বিদ্বেষী। এক কট্টর সমকামী হ্যারী ব্রিট এ ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। কনেকটিকাটে এই ছবি প্রদর্শনের সময়ে প্রতিবাদকারী জনতার মধ্যে থেকে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। হ্যানডবিলের মাধ্যমে তারা জানাল, এ ছবি সমকামী-দের বিরুদ্ধে' বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। প্রতিবাদীদের নেতা মাইকের ডাউসনের বক্তব্য: ছবিটি স্পষ্টতই আনন্দ-বিরোধী। কিছু আনন্দকামী মানুষকে স্বেচ্ছায় জঘন্য অপরাধের শিকার হতে দেখানো হচ্ছে এ ছবিতে। তবে ছবিটির পরিচালক জানিয়েছেন, সমকামীদের অভিযুক্ত করা এ ছবির উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এটি সমকামী জগতের সার্মাগ্রিক নয়, আংশিক চিত্রায়ণ মাত্র।

নব-নিরোধক

ভাঙের পাতা থেকে মহিলাদের জন্যে গর্ভনিরোধক বটিকা তৈরির চেষ্টা চলছে। উদ্যোক্তা ইজরায়েলের এক গবেষক দল। এর অল্প মাত্রার ব্যবহার ইঁদুরদের গর্ভাধানের ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার জন্যে এবং বেশি মাত্রার ব্যবহার মর্কট বাঁদরদের ক্ষেত্রে ৬০ দিন পর্যন্ত নিরোধক হিসেবে কর্মক্ষম থাকে। একথা জানিয়েছেন ইচিলব হাসপাতালের এই বিজ্ঞানী দল। বেশি মাত্রায় ভাং-সেবী মহিলাদের প্রজনন-ক্ষমতা কিছু দিন পরে আপনা থেকেই কমে যাওয়ায় তারা নতুন নিরোধ উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন।



লনডনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাচের শিক্ষিকা তৃষ্ণা ডালাসের নির্দেশনায় বোমবাইয়ের স্কুল অব ক্ল্যাসিকাল ব্যালে অ্যানড ওয়েসটার্ন ড্যানসেস এক নাচের আসর বসিয়েছিল। ফটোতে স্কুলের ছাত্রীদের এক বিশেষ ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে

তাম্রকূট

তাম্রকূট বিলাসীদের পক্ষে দুঃসংবাদ। কিউবার বিশ্ববিখ্যাত হাভানা চুরুটের উৎপাদন এবছর আশানুরূপ হয়নি। তাই বিদেশে চুরুট রফতানি বন্ধ থাকবে। মাত্র ১০ শতাংশ তামাক পাতা চাষে যে পরিমাণ চুরুট তৈরি হবে তা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেই লেগে যাবে। কারণ কিউবানদের মধ্যে অনেকেই চুরুট সেবী বলেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট শ্রীফিদেল কাস্ত্রো।

হৃদয়ঘটিত

গর্ভাবস্থায় ৬ বার হারট অ্যাটাকের পরেও অ্যান মারফি প্রসব করলেন নির্বিঘ্নে। ৬ পাউনডের এই শিশুটি হয়েছে গ্ল্যাসগোর হেয়ারমাইরেস হাস-পাতালে। ঘটনাটি প্রসূতি-ইতিহাসের একটি রেকরড। 'সিজার-শিশুটি' প্রসব করার পরেও শ্রীমতী ছিলেন দিব্যি খুসি। তিনি অবশ্য হৃদ-রোগে আক্রান্ত হবার বেশিরভাগ সময় ঐ হাসপাতালের বিশেষ সেবা-বিভাগেই কাটিয়েছিলেন।

টি ভি-রোগ

করাচির টি ভি দর্শকরা ওমান ও কোয়েত কেন্দ্র ধরার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। উদ্দেশ্য: ভারতীয় ছবি দেখা। বাড়ির ছাদের অ্যানটেনায় তাই নতুন কায়দা। এজন্যে অ্যানটেনার দাম পর্যন্ত বেড়ে গেছে। একটু নজর উঁচু থাকলে শহরের বাড়িগুলোর ছাদে অ্যানটেনার সঙ্গে বাসন পর্যন্ত ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। এতে নাকি পাকিস্থানের চলচ্চিত্র-শিল্প মার খাচ্ছে। ১৯৭৭ সালেও একবার করাচিতে বোমবাই টি ভি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা অবশ্য আবহাওয়ার গোলমালে এবং অল্পদিনের জন্যে।

মমি শিশু

ভাড়াটের মৃত্যুতে ঘর সাফ করতে গিয়েই বিপত্তি। আবর্জনা সরাতেই চোখে পড়ল একটা ট্রাঙ্ক। প্যাটরার মধ্যে থেকে বেরুলো ৪ থেকে ৬ মাসের এক শিশুর পচা-গলা মৃতদেহ। সম্ভবত মেয়ে, সারা গা পোশাকে ঢাকা। শিশুটি মারা গিয়েছিল এই শতকেরই তিরিশের দশকের কোনো সময়ে। মৃতদেহটি ছিল প্লাস্টিকে আগাগোড়া মোড়া। ঐ বন্ধ প্যাটরা থেকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সালের কিছু সংবাদপত্রও পাওয়া গেছে। ভাড়াটে ছিলেন ৭৫ বছরের এক বিধবা মহিলা। ঘটনাটি নিউ ইয়রকের।

পুতুল প্রতারণা

ঠেলাগাড়িতে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাঁদছিল। 'মা' এসেছিল হীরে কিনতে। ইতালির টেরামো শহরের এক জহুরীর দোকানে। হীরেটা পছন্দও হল। দাম মাত্র সওয়া দু'লক্ষ টাকার মত। তা হোক, তবু পছন্দ যখন। 'স্বামী' বাইরে দাঁড়িয়ে। তাকে একবার অন্তত দেখানো দরকার। 'আমার বাচ্চাটা রইল একটু দেখবেন, কেমন' ভদ্রমহিলা বাইরে বেরুলেন। সঙ্গে হীরেটা। বেরুলেন তো বেরুলেনই। দু'মিনিট তিন মিনিট। বাচ্চা আর কাঁদেনা। কাঁদবে কেন? ও তো সে-ই বিদ্যুৎ-চালিত কাঁদুনে পুতুল। "বাবা-মা" ততক্ষণ বেপাত্তা, বামাল।

রাজ-দরজি

শ্যাম দরজি জাতিতে ভারতীয়, দোকান হংকং-এ; কিন্তু রাজ-পোশাক নির্মাতা। ডিউক অফ কেনট স্বয়ং রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের এক জ্ঞাতি-ভাই। তিনি সৈন্যদলের পদস্থ ব্যক্তি হিসাবে চীন সফরের সময় শ্যাম দরজির কাছে তার স্যুট তৈরি করিয়েছিলেন। তার দোকানে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার, বৃটিশ সামরিক প্রধান, তাবড় হোমড়াচোমড়াদের ছবি। ডিউক অফ কেনট হংকংএর কার্টপিস দিয়ে স্যুট-টুট বানালেও নিজে কিন্তু 'বৃটিশ দ্রব্য কেনো' আন্দোলনের একজন প্রধান পাণ্ডা।

গর্ভবতী (পুং)

বাইশ বছর বয়সের লক্ষ্মণ হাসপাতালে এসে হয়ে গেল শ্রীমতী লক্ষ্মী। কর্ণাটক রাজ্যের কোলার সরকারি জেলা হাসপাতালে লক্ষ্মণের সিজারিয়ান অপারেশন করতে গিয়েই এই পরিবর্তন প্রথম চোখে পড়ে গরিব খেতমজুরের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে লক্ষ্মণ ক্লাস সিকস পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে যায় বাঙ্গারপেটের একটা হোটেলে। লক্ষ্মণের বয়স এখন ২২ আর হোটেলের মালিকের বয়স ২৫।

লক্ষ্মণের সঙ্গে হোটেল মালিকের দহরম মহরম একটু বেশি। এই মেশামেশির পরিণতি যা হয় তাই হল, অর্থাৎ লক্ষ্মণ 'গর্ভবান' হয়ে পড়ল। লক্ষ্মণের মা-বাবা গ্রামের গরীব গুর্বো মানুষ, ফলে তারা রীতিমত ভয় পেয়ে জড়িবুটি দিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে চাইলেন। কিন্তু বিশেষ ফল না হওয়ায় হাস-পাতালেই ভর্তি করতে হল। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা লক্ষ্য করে ডাক্তাররা সিজা-রিয়ান অপারেশন করলেন।

রটে গেল গ্রামের একটা ছেলে রাতারাতি মেয়ে বনে গেছে। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিসত্যি তা নয়। লক্ষ্মণ আগাগোড়াই মেয়ে। মেয়ে হয়েই সে জন্মেছিল। ডাক্তাররা বলছেন, তার ভগাঙ্কুর ছিল এতবড় যে মনে হত সেটা বুঝি পুরুষের লিঙ্গ। তার মা-বাবাও সেই ভুলই করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকে লক্ষ্মণ নিজেও মেয়েলি পোশাকআশাক একদম পছন্দ করত না, আর মেয়েদের দিকেও সে বেশি নজর দিত না। ছেলেদের সঙ্গেই ছিল তার যত ভাবসাব। তবে লক্ষ্মণের শরীরের অন্যান্য নারীজনিত লক্ষণের কথা সংবাদে কিছু জানা যায়নি।

লক্ষ্মণের অন্য তিন ভাইবোন একেবারে স্বাভাবিক যৌনজীবনের অধিকারী বলে জানা গেছে।



অস্ত্রের বদলে ইনাম

স্বেচ্ছায় বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র সরকারের ঘরে জমা দিন। দিলে, ইনাম মিলবে। সরকারী ঘোষণায় সাড়া মিলেছে। অনেকেই অস্ত্রগুলি গোলা জমা দিয়ে পুরস্কার নিয়েছেন। অস্ত্র জমা দেবার জন্যে নির্দিষ্ট ১৮ দিনে বাংলাদেশে মোট ৬৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৬৯টি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশ, ২৫৪টি বিস্ফোরক ও ২১ হাজার ৮০৩ রাউনড ন্যানান ধরনের গুলি জমা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, এখনো অনেকেরই হাতে রয়েছে বহু বেআইনী অস্ত্র।

(দৈনিক বাংলা)

হাতির কাছে ঠাণ্ডা

চট্টগ্রামের উখিয়া থানার খুলিয়া পালং গ্রামে ধান ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিলেন ঠাণ্ডা মিয়া। মাচার ওপর ছোট্ট লম্ফ জেলে নিশ্চিন্ত হয়েই বসেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে একটি বুনো হাতি তাকে আক্রমণ করে। শুঁড়ে পাকিয়ে ধরে পায়ের তলায় পিষে মারে ঠাণ্ডা মিয়াকে। (দৈনিক বাংলা)

ঘুষ ?

মতলব থানার দৌলতপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে জাল নোটের সরঞ্জাম সহ ৫০ টাকার ৬টি জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মূল পাণ্ডা অবশ্য পালিয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু ঐ যন্ত্রপাতি আর টাকাকড়ি।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

বাসনার শব্দ

খালিয়া গ্রামের বাসনা ভোর রাতে গিয়েছিল আম কুড়োতে। সঙ্গে ছিল ছোট ভাইটি। তের বছর বয়সের এই কিশোরী কিন্তু কোঁচড় ভরে আম নিয়ে আর বাড়ি ফিরল না। কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। পরে সে বাবা মার কাছে ফিরে এল শবদেহ হয়ে। দুষ্কৃতকারীরা পাশের কলাবাগানে তার লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

(দৈনিক বাংলা)

পুনর্মিলন

স্ত্রী সালেহা বেগমকে হত্যার অভিযোগে ঢাকার যুব নেতা এ হতেশাম উদ্দীন অহমদ ইকবালের ফাঁসি হয়ে গেল ভোর চারটের সময়। তার প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করার জন্য বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দলই জিয়াউর রহমানের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ ইচ্ছামত তাকে জুরাইন গোরস্থানে সালেহার কবরের পাশেই কবরস্থ করা হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক)

রব এসেছেন তোহা গেছেন

লনডন, পশ্চিম জারমানী ঘুরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আ. স. ম আবদুর রব ফিরে এসেছেন। বিমান ঘাঁটিতে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য সকলে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিকে চীনের কমিউনিসট পারটির কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সাম্যবাদী দলের মহম্মদ তোহা গেছেন চীন।

(দৈনিক বাংলা)



বাংলাদেশের অভিনেত্রী শুভ্রা

পৃথক ফল

জ্যোৎস্না ভালবাসত মনোয়ার হোসেনকে। কিন্তু বাড়ির লোকের এ বিয়েতে মত নেই। ফলে জ্যোৎস্না প্রস্তাব দিল দুজনেই চলন্ত জামালাবাদ এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে। ঝাঁপিয়ে পড়লও তারা। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল জ্যোৎস্না। প্রাণ দিল বেচারি মনোয়ার।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

চিনতে হবে

যশোরের কোটচাঁদপুর অঞ্চলে একদল সশস্ত্র ডাকাত একটি বরযাত্রীর গাড়িতে হামলা চালায়। তারা বরযাত্রীদের ছুরিকাঘাত করে ১২ হাজার টাকার মালপত্র নিয়ে পালায়। এই বরযাত্রীরা গাড়ি চড়ে জয়াদরা গ্রাম থেকে বাগুডাঙ্গা গ্রামের দুলাল বিশ্বাসের বাড়ি যাচ্ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। নারায়ণচন্দ্র থানায় ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ তাতে রাজী হয় না কারণ তাদের যুক্তি হচ্ছে কাউকে যখন চেনা যায়নি তখন ডায়েরি কেন ? (দৈনিক বাংলা)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

রহিমা ঢাকায় এসে হারিয়ে গেছে। বাড়ি ফরিদপুরের মাটিপাড়া গ্রামে। পিসেমশাই ওয়াজুদ উকিল ঢাকায় থাকেন এইটুকুই সে জানে। আট বছরের রহিমা অবশ্য হারিয়ে গিয়ে অথৈ জলে পড়েনি। সে এখন রয়েছে সাধারণ বীমা করপোরেশনের সহকারী ম্যানেজারের ফ্ল্যাটে। সহকারী ম্যানেজার প্রণবকুমার চক্রবর্তী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রহিমাকে ফেরৎ নেবার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। (দৈনিক ইত্তেফাক)

রাজ্যে রাজ্যে

রাজমাতা জীজাবাঈ-এর অনিশ্চিত ভাগ্য

পরীক্ষিৎ সাহনি বোমবের ফিলম জগতে একজন নামকরা লোক। তিনি বলরাজ সাহনির ছেলে এটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, হিন্দি কাহিনীচিত্রে নায়ক হিসেবেও তার এখন বেশ নাম হয়েছে। এ হেন পরীক্ষিৎ মোটর অ্যাকসিডেনটে বেশ জখম হয়েছিলেন। পায়ে চোটও লেগেছে সাংঘাতিক।

বোমবের রূপালি পর্দার নায়ক নায়িকারা মাঝে মাঝেই জখম হন, চোটও কম লাগে না। রিসক নিয়ে শুটিং করতে গেলে মাঝে মধ্যে আহত হওয়া নতুন কিছু নয়। যেমন রোজগারপাতি তেমন খাটাখাটুনি তো থাকবেই।

কিন্তু পরীক্ষিৎ সাহনি জখম হয়ে মুসকিলে ফেলে দিয়েছেন মহারাষ্ট্র সরকারকেই।

মহারাষ্ট্র সরকার জিজাউ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ একটা ছবি তুলছেন শিবাজীর মা জীজাবাঈ-এর জীবনী নিয়ে। ছত্রপতি শিবাজীও স্বাভাবিক কারণে এই ছবির অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন। পরীক্ষিৎ সাহনি সেই শিবাজীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

জিজাউ প্রতিষ্ঠান প্রথম গড়ে তুলেছিলেন শালিনী পাতিল। তিনি এখন রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী। আন্‌তুলে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গড়ছিলেন তখন শালিনী তার সঙ্গে কোন সহযোগিতা করেননি কারণ তাকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হয়নি। নানা টালবাহানার পর অবশ্য তিনি রাজস্ব দপ্তরই হাতে নিতে বাধ্য হন।

সেই শালিনী পাতিলকেই এখন উত্তর দিতে হচ্ছে, জীজাবাঈ-এর জীবনী নিয়ে প্রস্তাবিত ঐ চলচ্চিত্রটির কী হল।

এরকম প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রটির মহরৎ হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ১ জুলাই। দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল ; কিন্তু ছবি আর শেষ হল না। অথচ এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে ৪৫ লাখ টাকা। তখন এর পেছনে খরচের মোট হিসেব ধরা হয়েছিল ৬৫ লাখ টাকা। তার মানে এখন জিনিসপত্রের দাম যেমন বেড়েছে তাতে বাজেট আরও বেশি ধরতে হবে।

বোমবে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন এই ছবির জন্যে অনুদান দিয়েছিল সাড়ে তিন লাখ টাকা। প্রশ্ন উঠেছে সেই টাকাটা নিয়েই। জলে যাবে না তো সে টাকা ? জিজাউ প্রতিষ্ঠানের চলচ্চিত্র বিষয়ক সম্পাদক এ ভি গাদকারি এই আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন।

আসল কথা, চলচ্চিত্রটির মোট ষোল রীল তোলার কথা। এ পর্যন্ত উঠেছে আট রীল। অথচ খরচ হল দুই-তৃতীয়াংশ। বাকি আট রীল তুলতে যদি আরও ৪৫ লাখ খরচ হয় তবে তা যোগাবে কে ? অথচ গাদকারি বলছেন, 'আর ক' মাসের মধ্যেই ছবিটা আমরা শেষ করে ফেলব।' ছবি কেন দেরি হচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে গাদকারি পরীক্ষিৎ সাহনির জখম পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছেন। তার মানে পরীক্ষিতের ওপর এখন যত দোষ গিয়ে পড়ছে। বেচারি পরীক্ষিৎ তো রাজনীতির সাতে পাঁচে নেই।

বোমবে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন-এর মধ্যে জানিয়েছে, ছবির শুটিং যদি আবার শুরু হয় তবে তারা আরও দেড় লাখ দিতে রাজি আছে। তাদের শর্তও আছে একটা ঃ ছত্রপতির মা-কে নিয়ে তোলা প্রস্তাবিত 'রাজমাতা' ছবিটা বোমবের প্রত্যেক স্কুলে বিনা পয়সায় দেখাতে হবে। কিন্তু জিজাউ প্রতিষ্ঠান সে ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি বরং তারা এখন বোমবে মারকা কোন প্রোডিউসার খুঁজছে যাতে ছবিটা মানে মানে শেষ করা যায়। ★

জেলায় জেলায়

জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদের দোকান বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ওই সব ঘাঁটিতে সন্ধ্যার পর হুল্লোড়বাজি শুরু হয়, অশ্রাব্য খিস্তি-খেউর চলে। মেয়েদের হাত ধরে টানাটানিও হয়। পুলিশ খুব ভাল



করেই এইসব ঘাঁটি চেনে। চাকরি বাঁচাতে মাঝে মাঝে তারা সেখানে হানা দেন। দুই চারটা মদের বোতল আছড়ে ভাঙা হয়। একটু ধমক-ধামক। তারপর আবার যে কে সেই।

(ত্রিস্রোতা/জলপাইগুড়ি)

লোকটি পাগলা নামেই পরিচিত ছিল। কৃষ্ণনগর স্টেশন প্ল্যাটফরম ছিল তার ঠিকানা। সারাদিন সে ভিক্ষা করত, দিনভোর যা তার ভিক্ষা জুটতো, দিনান্তে তাতেই তার কোন রকম আহার জুটতো। সেই পাগলা (৪৫) মারা গেল। পুলিশের ভাষায় অপুষ্টিই তার মৃত্যুর কারণ। মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠাতে দেখা গেল পাগলার কোমরের থলিতে নগদ একশ তেতাল্লিশ টাকা। অন্যদিকে খবর, পাগলের কাছ থেকে এর আগে একবার পাঁচশ টাকা খোয়া গেছে। (চ্যালেঞ্জ রানাঘাট)

নবদ্বীপের পোড়ামাটের শ্যামল মণ্ডলের নিত্য পূজিত গোপাল এখন কলকাতায় থানায় অজস্র ভক্তের দেওয়া সন্দেশ খাচ্ছেন। সম্প্রতি আট ধাতুর গোপাল বিগ্রহ চুরি হয় এবং কলকাতায় চালান যায়। মূর্তিটির ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ কেজি এবং মূল্য প্রায় দু'হাজার টাকা। দূর বিদেশে মূর্তিটি পাচার হয়ে যাবার আগে এক গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে বড়বাজার থানার পুলিশ ঐ মূর্তিটি উদ্ধার করে। জাগ্রত দেবতারূপে গোপাল এখন বড়বাজার থানায় পূজা পাচ্ছেন। (মুক্তিদূত/নবদ্বীপ)

কেতুগ্রাম থানার 'শতদল' ক্লাবের উদ্যোগে বর্ণপরিচয়ের ১২৫তম জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হয় এবং বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দান করেন



ঐ ক্লাবের সম্পাদক। এদিন ক্লাবের পক্ষ থেকে ২৫ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর জ্ঞানে সাহায্যের জন্য প্রত্যেককে বর্ণপরিচয়, স্লেট ও পেনসিল দেওয়া হয়।

(কাটোয়ার জোয়ার/কাটোয়া)

ছবি ঃ কেশব ঃঃ জি. সাহা

দেশে দেশে

এল সালভাদরে বিপ্লব ও তারা চোদ্দজন

বল্মীক



সান সালভাদর : বিপ্লবী হানার পর

দশ হাজার লোকের শহর সান মারকোসের ওপর হঠাৎ নেমে এল মধ্যাহ্নের অন্ধকার। কয়েকশো গেরিলা একটি যাত্রীবাহী বাস হাইওয়ের ওপর থামিয়ে শুরু করল লুটপাট। যাত্রীরা যে যার গন্তব্য পথে অতি দ্রুত হাঁটা দিলেন। মুহূর্ত মাত্র, ফাঁকা হয়ে গেল সমগ্র অঞ্চল।

সান মারকোস শহরের সাময়িক নিয়ন্ত্রণ ভার চলে গেল গেরিলাদের হাতে। রাজধানী সান সালভাদরে খবর চলে গেল। ট্রাক ভর্তি সেনা ও পুলিশ বাহিনী পাঠানো হল সান মারকোসে। রাজধানী থেকে এ শহরের দূরত্ব মাত্র আট কিলোমিটার।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রীতিমত মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হল। ঠিক এই সময়ই ছুটি হয়েছে কলকারখানার। রাস্তার চেহারা দেখে তারা তো হতভম্ব। দু'পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিতে হল প্রায় বারোজন শ্রমিককে।

সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে গেরিলারা সান মারকোস থেকে তিন কিলোমিটার সরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন সানটো টোমাস শহরে। এ শহরটা সান মারকোসের চেয়ে বড়।

গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষের এ শুধু একটাই নমুনা। আরও ঘটনা ঘটে গেছে, এখনও প্রায় রোজই এমন ঘটনা ঘটছে লাতিন আমেরিকার এল সালভাদরের মত ছোট্ট একটি রাষ্ট্রে।

উত্তর যেখানে দক্ষিণকে চুম্বন করেছে এল সালভাদর সেই মধ্য ভাগের ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। কিন্তু লাতিন আমেরিকার অন্য রাষ্ট্রগুলির মত জনবিরল নয়, বরং হাইতির পরে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। চল্লিশ লক্ষের মত এর জনসংখ্যা। সরকারি নাম রিপাব্লিকা দ্য এল সালভাদর। প্রভু যীশু এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন বলে এখানে খৃস্টপ্রভুর নাম সেভিয়ার আর তাই রাষ্ট্রের নামও স্পেনীয় ভাষায় সালভাদর বা এল সালভাদর। বহুকাল ধরে ছিল স্পেনের কলোনি। তারপর নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৮২১ সালের ১৫ সেপটেমবর স্বাধীনতা পায় এল সালভাদর। কিন্তু স্বাধীনতা নামে মাত্র।

ছোট্ট এই রাষ্ট্রে মানুষের দারিদ্র্যের কোন শেষ নেই। এখানে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের মাইনে একই, একবার একজন শ্রমিক যে মাইনে নিয়ে কাজে ঢোকে সেই মাইনেতেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু জাতীয় সম্পদের দিক থেকে এল সালভাদর কারোর চেয়ে কম যায় না। তাহলে যায় কোথায় সেই সম্পদ ?

এল সালভাদরের যাবতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি সবই নিয়ন্ত্রণ করে চোদ্দটি পরিবার। পরিবারগুলি হল দুইনো, বিগালাদোস, হিল, মেস আযাউস, দ্য সোলা, সোল মিলেৎ, গইরোলাস, আলভারেজ, মেলেনদেজ, মেনেনদেজ কাসট্রো, দেইনিজার, কুইনোনেজ, গ্যারসিয়া প্রেইতোস এবং ভিলামোভাস।

এই চোদ্দটি পরিবার আবার একে অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না। যেমন দুইনোরা করে কফির ব্যবসা। বছরে ৪০ হাজার কুইনটাল কফি তুলে নিয়ে তারা বিক্রি করে দেয় নিউ ইয়রকের বাজারে।

তেমনই মেস আযাউসদের আছে বীয়ারের একচেটিয়া ব্যবসা। সোল মিলেৎ পরিবার নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় কৃষি ব্যবসা ও কমার্শিয়াল ব্যাংকিং শিল্প মেলেনদেজ পরিবার দেশের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। কুইনোনদেজ করে মেসিনারির একচেটিয়া ফলাও কারবার। এইসব পরিবারের অধিকাংশই হয় স্পেনিয়ারড, না হয় ইহুদি।

এল সালভাদরে এই চোদ্দটি পরিবারের জন্য কোন আমদানি কর দিতে হয় না।

এখন বিচার করে দেখা যাক, কী বিপুল এর প্রাকৃতিক সম্পদ, কী সম্ভাবনাময় এর শিল্পোৎপাদক ভবিষ্যৎ।

এল সালভাদর কফি উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এর ক্ষেত খামারে গুয়েতেমালা বা কোসটারিকার চেয়ে দ্বিগুণ উৎপাদন হয়। ১৮৩৮ সালে প্রথম সানটা আনা প্রদেশে কফির চাষ শুরু হয়। মাত্র ৬২ বছরে এই কফিই দেশের বৃহত্তম জাতীয় সম্পদ হয়ে পড়ে। কফি ছাড়া তুলো আর ফলাও এদেশের বৃহৎ পরিমাণ বিদেশী টাকা এনে দেয়।

বিপ্লবের ঘটনা এদেশে নতুন কিছু নয়। অসামান্য দারিদ্র্য এবং শোষণই এদেশের মানুষজনকে বারবার বিপ্লবে উদ্দীপিত করেছে। চোদ্দটি পরিবারের অলিগার্কি ভাঙার জন্য সাধারণ মানুষ বারবার গোপনে অস্ত্র ধরেছেন, মার খেয়েছেন, মেরেছেন, হেরে গিয়ে পালিয়ে গেছেন, আবার ফিরে এসেছেন নতুন অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে।

১৯৩২ সালে ২২ জানুয়ারি বিপ্লবীরা প্রথম সার্থক আক্রমণ চালিয়েছিলেন সোন-সোনেৎ, সোনজাকেৎ এবং নাহুইজালকো শহরে। এখানকার সব জমিদারদের হত্যা করে বিপ্লবীরা চারদিন ধরে এলাকাটি স্বাধীন রাখেন।

এল সালভাদরের চোদ্দ পরিবার নিয়ন্ত্রিত সরকার তখন মারকিনী সহায়তায় এই পাঁচ হাজারের মত 'বলশেভিক' বিপ্লবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ১৯৪৪ সালের এপরিল–মে মাসে আবার অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয় এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়।

কিন্তু বিপ্লব থেমে থাকেনি। বারবার গ্রামে ও নগরে হানা দেয় মুক্তিপ্রয়াসী তরুণের দল।

বিপ্লবীদের মধ্যে প্রধানত মাওপন্থী কমিউনিসট ও রোমান ক্যাথলিকদেরই প্রভাব বেশি। সাধারণত এরা একত্রেই হানা দেন বিভিন্ন স্থানে।

এই বিপ্লবীদের ঠেকাবার জন্য এল সালভাদরের চোদ্দটি পরিবার ভাড়াটে গুণ্ডা আমদানী শুরু করে। এই ভাড়াটে গুণ্ডাদের কীর্তিকলাপ হঠাৎ দেশের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে একটি ঘটনায়।

অসকার রোমেরো একজন বিপ্লব সমর্থক আরচবিশপ। তিনি চারচে প্রার্থনাসভাকালে গোপন আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর সমাধি মিছিলে স্বয়ং পোপ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এই মিছিল হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলি চালায়। তাতে প্রায় ৫০ জনের মত মারা গেছেন।

পোপ পলের প্রতিনিধি স্বচক্ষে এল সালভাদরে এসে সরকারি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড দেখে গেলেন।

কেন গুলি চলল ? মিছিলে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল, 'গুয়াদালুপে, জনগণ জিতবেই। রোমেরো রোমেরো, তুমি আমাদের তুমি আমাদের।' শ্লোগানই হৃৎকম্প ধরিয়ে দিয়েছে চোদ্দটি পরিবারের। ★

ঘরোয়া

ইংরাজি স্কুলের সমর্থনে সোমক রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ বিশ্বাস দু'খানি চিঠি 'ঘরোয়া' আসরে পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠি যে এমন আমিষ ও উত্তেজক বুঝিনি। ছাপবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ। বাংলা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়াদের কাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠির হুল আসছে। ব্যঙ্গে ঝাঁঝালো, বিদ্রূপে মর্মঘাতী, সৌজন্যে অন্তর্স্পর্শী, বিনয়ে দ্রব। তার থেকে বাছাই করে প্রথম কিস্তি এবারে ছাপা হল। দ্বিতীয় কিস্তি ছাপা হবে পরের সংখ্যায়।

কিন্তু বিতর্কের আসর এবার গুটিয়ে আনতেই হবে খুব সত্বর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। প্রধানত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এ আসরে অংশ নিয়েছেন গত সাত মাসে। যাদের সংখ্যা তিনশোরও বেশি। কিন্তু আমরা টনক নড়াতে পারলাম না তাদের, সেই যাদের বলা হয় এডুকেশ্যানিসট অর্থাৎ কিনা শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষাতাত্ত্বিক। রক্তকরবীর রাজার মত অহমিকার জাল ছিঁড়ে তারা কি শেষকালে বেরিয়ে এসে আসরের গোলযোগে গলাযোগ করবেন?

পরিচালনা

নিবারণ চক্রবর্তী

ভাই অভিজিৎকে, দাদা

ভাই, অভিজিৎ, তোমার লেখা চিঠিটা আমি বেশ কয়েকবার পড়লাম। ভালো লাগল তোমার বলিষ্ঠ ভাব। কিন্তু দৃঢ়তা ঢাকা পড়ে গেছে দাম্ভিকতায়। আমি এক গন্ধ, বর্ণহীন গরীব অনামী সরকারী কর্মচারীর বড় ছেলে। ১৯৭৪ সালে বি-কম (অনারস) নিয়ে পাশ করে বর্তমানে বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভুটানে এক ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক। বাল্যে সরকারী অবৈতনিক স্কুলে পড়াশোনা করি। তারপরে মাইনে দিয়েই পড়তে হয়েছে। কোনরকম সাহায্যকারী ছাড়াই আমি সমস্ত পড়াশোনা করেছি, যদি বর্তমানের মত অবৈতনিক স্কুল মাধ্যমিক পর্যন্ত থাকত তাহলে হয়তো সেই স্কুলে গিয়েই ভর্তি হতাম। যাই হোক, এই আমার পরিচয়। খুবই সাধারণ। উল্লেখ-যোগ্য কিছুই নেই। আমার বাবা বছর দুই হল অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে আমাকেই সংসার চালাতে হচ্ছে।

তোমার ১ নমবর বক্তব্যের উত্তরে বলি পাঙচুয়ালিটি এবং ডিসিপ্লিন শুধু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই তৈরি হয় না; বাংলা স্কুলেও হয়। শিক্ষারে সঙ্গে আত্মিক যোগ থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা আপনিই আসে। সেই শিক্ষার জন্য ইংরাজি স্কুলে পড়তে হয় না।

দু' নমবর বক্তব্যের বিষয়ে জানাই, স্মারটনেস নির্ভর করে প্রধানত আর্থিক এবং মানবিক দৈন্য থেকে বন্ধনমুক্ত হওয়ার উপর। তুমি যে স্মারটনেস দেখেছ সেই স্মারটনেস-এর পেছনে আর্থিক সাচ্ছল্য না থাকলে বাস্তব জীবনে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অনেক অন্যায়, অনেক ত্রুটি আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই বিপাকে পড়ে। তা যদি না হতো তাহলে আজ কোটি কোটি বিদ্যাসাগর আমাদের ভারতবর্ষে ঘোরাফেরা: করতেন। ভালো করে পড়লে জানতে পারবে বিদ্যাসাগর যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তার ফল হিসাবে তিনি খুব অল্পই পেয়েছেন।

তিন নমবর বক্তব্যে যা বলেছ সেটা সত্যি। প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের ইংরাজি বলতেই হবে। সেটা কিন্তু দু'শো বছরের পরাধীনতা নয়, মুক্তির জন্যই।

Competitive Examination-এর কথা বলছ? সেখানে সাধারণ স্কুলের ছেলেরা কেন ভাল ফল করে না জান? তারা সাধারণ বাংলা স্কুল থেকে পাশ করে বলে, তারা ভালো মত ইংরাজি বলতে বা লিখতে পারে না বলে, তারা সাহায্যকারী পুস্তক বা শিক্ষক পায় না বলে। কিন্তু তা বলে তাদের হেয় করো না। মনে রেখো, জ্ঞানই আসল মাধ্যম।

ভালো করে ভেবে মনে করে বল দেখি, এ যাবৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক'জন প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছে তথাকথিত ইংরাজি স্কুল থেকে। আর যদিওবা করে তবে কার যোগ্যতা বেশি, তাদের, না গণ্ডগ্রাম থেকে যে ছাত্রটি ভালো করেছে তার? তুমিই বিচার করে বল।

যাই হোক তুমি বয়েসে আমার থেকে অবশ্যই ছোট। তাই তুমি বললাম। তাতে তোমার শিক্ষা ও আভিজাত্যে যদি বাধে, আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

শিখরকুমার রায়, ফুন্টসোলিং, ভুটান

সোমক ও অভিজিৎ সমীপেষু

আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। 'বাংলা স্কুলের' ছাত্র ছিলাম দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। আমি জিন্‌স পারি না, কিন্তু বাঙালীয়ানা ফলাতে বিয়ে বাড়িতে ধুতি পানজাবি পরি না। আমি বলপেনে লিখি, কিন্তু বাঙালীয় ফলাতে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়া ইংরাজি স্কুলের বাঙালী ছাত্র সোমকের মত সাধারণ বাঙালীদের গড্ডলিকা আখ্যা দিই না, দিতে ভয় পাই। কারণ তাদের মধ্যেই আছেন আমার—আমাদের বাংলা স্কুলের ছাত্রদের বাপ-পিতামহরা। আমি সোমকের মতো মাধ্যমিকে ৭৭% পাইনি, ৬৯% নমবর পাওয়া বিদ্যেতে সাধারণ বাঙালীদের গড্ডলিকা বলি না। সোমক বলেন—ইংরাজি স্কুলের বাঙালী ছাত্রদের অন্যতম হয়েও। কারণ বোধ হয়—সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফাদাররা নেই যারা সাত বছর ধরে মরাল সায়েনস শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

আমি বুঝিনা জিন্‌স পরে ইয়াংকি-আনা ফলান ছাড়া আর কী করা যায়। আমি জানি না বাংলা পত্রিকায় চিঠি লিখতে গিয়ে ৬০টা ইংরাজি শব্দ বসিয়ে বইমেলা থেকে দেবব্রতর রেকরড কিনে শৌখীন রবীন্দ্রচর্চা ছাড়া আর কী করা যায়।

আমি রতিনির্বেদম দু'বার দেখেছি, আমি অমিতাভ বচ্চনের একজন ফ্যান, অবশ্য আমি Last Tycoon দেখিনি। যেসব চিত্রসমালোচকরা পত্র-পত্রিকায় রতিনির্বেদমের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রশংসা করেছিলেন অকুণ্ঠ, তারা বোধ হয় বাংলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শ্রদ্ধেয় চিত্র সমালোচকদের কাছে লেখকের অনুরোধ, অন্তত অভিজিতের স্বার্থে, অমিতাভ বচ্চনের সব ছবি এবং রতিনির্বেদমের সমালোচনা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন—'ইহা ইংরাজি স্কুলের দেশোদ্ধারের ব্রতে ব্রতী বাঙালী ছাত্রদের দেখিবার উপযুক্ত নয়। ইহা কেবলমাত্র আদর্শ বিদ্যানিকেতন মার্কা বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যেই।'

জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ কীরো সাহেব তার বইটি ইংরাজি স্কুলের কুসংস্কারহীন কালা সাহেবদের জন্যে লেখেননি। অভিজিৎকে জিজ্ঞাসা করি ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিদরা না হয় ভারতীয় বলেই বোধ হয় তার পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না কিন্তু কীরো সাহেব তো তার গুড মরনিং শেখানো ফাদারদেরই একজন ছিলেন। তাকে নিয়ে তো শুনেছি প্রতীচ্যেও অনেকে পড়াশোনা করেন।

অভিজিৎ কি সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেন না? না দিলেও উনি নিশ্চয়ই বড়দিনে সারারাত মানুষের মুক্তিদাতা সেই মহামানবের

ঘরোয়া

পুনরাবির্ভাবের জন্যে, অন্তত এই ইতু পুজোর বাংলাদেশে আর একবার প্রার্থনা করেন আর এই পৌত্তলিকতার দেশে জন্মেছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

অভিজিৎরা এক ঘুষখোরহীন জেনারেশন তৈরির স্বপ্ন দেখেন আর পরে আই এ এস অফিসার কিংবা মন্ত্রী হয়ে বাংলা স্কুলগুলো, যেগুলো শিক্ষকদের রাজনীতির আখড়া, যেখানে ছাত্রদের 'অরুচিসঙ্গত' কার্যকলাপ শেখানো হয়, সেই স্কুলগুলো তুলে দিয়ে ফাদারদের পরিচালিত, যারা Home-task-এর খাতার উপরে For God and Country লেখাতে শেখান, স্কুলের প্রবর্তন করবেন।

সোমকের বোন বাংলা স্কুলে পড়েন, যে স্কুলে এবার থেকে ক্লাস সিক্সে এ বি সি ডি শেখানো হবে, এতে সোমকের বোনদের কোন দোষ নেই, দোষ সেই সমস্ত রাজনীতিবিদদের যারা দেশ থেকে ইংরাজি স্কুলগুলো তুলে দেননি যাতে তাদের পরিবারের সন্তানরা চিরকাল অফিসের বড়বাবু হয়ে থাকতে পারেন আর এই হতভাগা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত দারিদ্র সীমার নিচের দরিদ্ররা চিরকাল কলমপেশা কেরানী হয়ে থাকতে পারেন।

সব শেষে কতকগুলো প্রশ্ন করব শ্রদ্ধেয় সোমক এবং অভিজিতের কাছে।

১) গড্ডালিকা মানে কী সাধারণ বাঙালীদের গড্ডালিকা বলার দুঃসাহস সোমকের কিভাবে হয়?

২) বাংলা স্কুলের ছাত্রদের অরুচিসঙ্গত কার্যকলাপ কী কী? ইংরাজি স্কুলের রুচিসঙ্গত কার্যকলাপ কী কী?

৩) ইংরাজি স্কুলের ছাত্ররা যতটুকু বাংলা জানেন বাংলা স্কুলের ছাত্ররা (১০% এরও কম) তা জানে না এর কোন ভিত্তি আছে কি?

কালিদাস বিশ্বাস, কলকাতা-১২

'চ্যালেনজের' বাংলা কি?

আমি একজন তরুণ প্রবাসী বাঙালী। গত ১ জুন সংখ্যার পরিবর্তনে 'জিনস্ পরি সুবিধার জন্য' নামক চিঠিখানা পড়ে, বিশেষ করে লেখক তার বক্তব্যে 'চ্যালেনজ ছুড়ে দিলাম···গ্রহণ করলে বুঝবো আপনাদেরও সুস্থ প্রতিযোগিতায় নামার Guts আছে' পড়ে মর্মাহত হলাম। লেখকের জানা উচিৎ ছিল প্রতিযোগিতায় নামার Guts আমাদের নিশ্চয়ই আছে। থাকবে না কেন? লেখক আরও অবাক করে দিয়ে লিখেছেন—'মনে রাখা দরকার ইংরেজি স্কুলে পড়লেই নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া হয় না।' এখানে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন করতে পারি—বাংলা স্কুলে পড়লেই কি নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া হয়? লেখক কি এসব কথা সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবেচিন্তে লিখেছেন? লেখক আবার লিখেছেন—'আপনাদের আদর্শ নিকেতনগুলি থেকে পাশ করা অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যখন 'রতি নির্বেদম' আর অমিতাভ বচ্চনের জন্য লাইন লাগায় আপনাদের সংস্কৃতি সেখানে বিপন্ন হয় না?' প্রশ্ন আবার ওঠে—কেউ যদি এসব কীর্তি 'ব্যাক্তিগত জীবনে' করে (সে বাংলা স্কুল, ইংরেজি স্কুল বা অন্য যে কোন ভাষাভাষীর ছাত্রছাত্রী হোক না কেন) তার জন্য কি সংস্কৃতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দায়ী? লেখক বাংলা জানি বা চর্চা করি বলে দাবি করেছেন, বলেছেন—'চ্যালেনজ দিয়ে বলব আপনাদের বাংলা স্কুলগুলোর ১০%ও তা জানে না।' বাংলায় যার এতো জ্ঞান তিনি কি 'চ্যালেনজ' এবং ১০%'এর পরিবর্তে 'প্রতি আহ্বান' এবং 'শতকরা দশ ভাগ' কথাটা (প্রতিশব্দ) লিখতে পারতেন না? আর স্মারটনেস? আমি মনে করি কোন স্কুলই স্মারটনেস-এর 'গ্যারানটি' দিতে পারে না। কারণ স্মারটনেস নির্ভর করে প্রতিটি মানুষের 'ব্যাক্তিগত রুচির' ওপর। **নারায়ণ সোম, গোয়ালপাড়া, আসাম**

নতুন!

প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসি

50% পলিসির মেয়াদ অন্তের পূর্বেই কয়েকটি কিস্তিতে বীমাকৃত টাকার ৫০% পাবেন।



100% আপনার পরিবার যে কোন সময়ে বীমাকৃত টাকার ১০০% পাবেন।



দু'ভাবে লাভবান হবার একটি আকর্ষক প্রকল্প

- পলিসির মেয়াদ অন্তের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বীমাকৃত টাকার ৫০% প্রাপ্তির সুযোগ
- যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরেও বীমাকৃত টাকার ১০০% প্রাপ্তির ব্যবস্থা

আপনি এই পলিসি ২০ বছর, বা ২৫ বছরের মেয়াদের জন্য নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ২৫ বছর বয়সে আপনি যদি ২০ বছরের মেয়াদের জন্য একটি প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসি নেন, তাহ'লে আপনি দুটি বিশেষ ধরণের সুযোগ পাবেন। ২০ বছর ধরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনি পলিসির শর্তসাপেক্ষে যে টাকা পাবেন, তাতে আপনার ছোটখাটো চাহিদা মেটাতে পারবেন। অধিকন্তু, যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরে যখন প্রিমিয়াম দেবার তাগিদ থাকে না তখনও, আপনার পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

একজন ব্যক্তি ৩৫ বছর বয়সে যদি ২০ বছরের মেয়াদে একটি ২৫০০০ টাকার পলিসি নেন, তাহ'লে তিনি এইসব সুযোগ পাবেন।

৪০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.00 টাকা

৪৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.00 টাকা

৫০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.00 টাকা

৫৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.00 টাকা

এমনকি মেয়াদ অন্তের পরেও যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলেও তাঁর পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

২০ বছরের মেয়াদের অন্তর্বর্তী কালে অথবা তার পরে যে কোন সময়ে মৃত্যুজনিত দাবীর ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে লভ্যাংশসমেত সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে, বীমাকারীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোন কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে থাকলে, তাসত্ত্বেও।

এই অনন্য পলিসি থেকে আপনার পরিবার দু'ভাবে লাভবান হবার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসির উল্লেখ করে এ সম্পর্কে জেনে নিন।

অনুগ্রহ করে আপনার জীবন বীমার এজেন্ট অথবা নিকটস্থ আমাদের কোন শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

RADEUS/LIC/SP-37

হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সত্যিই বন্ধ হবে কি ?

মৃণাল বসু



হাসপাতালের মেঝেতে রুগীর দশা

পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো সম্পর্কে অভিযোগ অনেক। একটা খুব সাধারণ অভিযোগ হলো—বড় ডাক্তারবাবুরা রোগীদের ভালো করে দেখেন না। বড় ডাক্তার মানে যারা শিক্ষকতার সূত্রে হাসপাতালগুলোর সঙ্গে যুক্ত। পরিভাষায় এদের বলা হয় ভিজিটিং ফিজিশিয়ান বা সার্জন। আউটডোরে এরা কমই আসেন। কেউ কেউ একেবারেই আসেন না। যারা আসেন তারাও নির্বাচিত কয়েকজন মাত্র রোগী দেখেন। ইনডোরের রোগীরা এইসব বড় ডাক্তারবাবুদের সকালে রাউন্ডের সময় দু-তিন মিনিটের জন্য পায়। বিকালে বা সন্ধ্যায় এরা কখনোই আসেন না। ভি আই পি রোগী থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। এর কারণ সবাই জানে : নিজেদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়েই এতো ব্যস্ত যে হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এরা পান না।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—এইসব ডাক্তার-শিক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেওয়া হবে যাতে হাসপাতালের কাজেই ওরা পুরো সময় দেন। যারা প্র্যাকটিস ছাড়তে রাজি নন তাদের চাকরিতে রাখা হবে না। কলেজ ছেড়ে তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন, সরকার সেখানে বাধা দেবেন না।

ডাক্তার-শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং করে দিলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে ? প্রথমেই দেখা যাক, নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে কতজন ডাক্তার এর আওতায় পড়বেন। পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজে আছে সাতটি। এ ছাড়া আছে শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হসপিটাল (পি জি) এবং স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন। শেষ দুটো প্রতিষ্ঠানে আইনত কোন ডাক্তার-শিক্ষকই প্র্যাকটিস করেন না। আবার সাতটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের সবাই যে প্র্যাকটিসিং, তাও নয়। ধরুন, যারা প্রি-ক্লিনিক্যাল কোর্সের শিক্ষক, তাদের সবাই নন-প্র্যাকটিসিং। কাজেই বাদ রইলেন ক্লিনিকাল কোর্সের শিক্ষকরা। প্রতি কলেজে পঁচিশজন করে ধরলে এদের সংখ্যা দুশোও হবে না। অবশ্য এর মধ্যেই রয়েছেন রাজ্যের বাঘা বাঘা ডাক্তাররা, যারা মোটা অংকের ইনকাম-ট্যাকস দেন সরকারকে। সরকারের খড়গ সরাসরি এদের বিরুদ্ধে।

এখানে বলা দরকার, ১৯৫৮ সালেই আইন করে সব মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের নন-প্র্যাকটিসিং করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে এই আইনে কিছু সংশোধন করা হয়। তাতে বলা হয়, যেহেতু কিছু কিছু বড় ডাক্তারকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক সরকার দিতে পারেন না, সেইহেতু ওরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আনডার গ্রাজুয়েট কলেজের ক্লিনিক্যাল কোর্সের শিক্ষকরা এই আইনে প্র্যাকটিসিং হয়ে গেলেন। অন্যন্যরা রয়ে গেলেন নন-প্র্যাকটিসিং। সেই অসম আইনই এখনও চালু রয়েছে।



আউটডোরের গাদাগাদি

অথচ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি—বেশ কয়েক বছর ধরেই মেডিকেল শিক্ষকরা নন-প্র্যাকটিসিং। দেশের সব রাজ্যেই নন-প্র্যাকটিসিং টিচিং ক্যাডার তৈরি করা হোক—এই পরামর্শ ন্যাশনাল হেলথ কাউনসিলেরও। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভবত আরো গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, এখানে মেডিকেল শিক্ষার মান গত কয়েক বছরে এত নিচুতে নেমে গিয়েছে যে সারা ভারত প্রতিযোগিতা বা ইউনিয়ন মেডিকেল সার্ভিসে এ-রাজ্যে থেকে খুব কম সংখ্যক ডাক্তারই সুযোগ পান। মেডিকেল ক্ষেত্রে রিসার্চ হয় না বললেই চলে। এ সবের জন্য দায়ী করা হচ্ছে ডাক্তার-শিক্ষকদের। অনেকেই এখন ভাবছেন, এদের ব্যবসায়ী মনোভাবের জন্য ছেলেরা ঠিকমতো ট্রেনিং পায় না। ঠিক সময়ে কোর্স শেষ হয় না ; ইউনিভার্সিটি 'ব্যাকলগে' ভোগে। মেডিকেল কারিকুলাম সেই ব্রিটিশ আমলে যা ছিল, তাই রয়ে গেছে। এই কারিকুলাম পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করার কথা কেউ ভাবেন না। অন্যদিকে, শিক্ষকদের মধ্যে একটা অংশ—প্রি-ক্লিনিক্যাল শিক্ষকরা, যারা নন-প্র্যাকটিসিং—নৈরাশ্য এবং হীনমন্যতার শিকার হচ্ছেন। অতিরিক্ত রোজগারের আশায় এদের কেউ কেউ এখন মেডিকেল ছাত্রদের জন্য বাড়িতে কোচিং ক্লাস খুলেছেন। কেউ বা নোট বই লিখছেন। সরকারী মহলের ধারণা, সবাইকে এক আইনের পর্যায়ভুক্ত করলে এসব অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে।

নতুন সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতার কয়েকজন নামী ডাক্তার-শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এদের সকলেই অখুশী। ওরা বললেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো বর্তমানে যে অব্যবস্থা বিরাজ করছে, তাতে ডাক্তারদের নন-প্র্যাকটিসিং করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন ভাবলে সরকার ভুল ভাবছেন। সাধারণ ক্লিনিক্যাল ইনভেসটিগেশনের সুবিধা নেই, ভালো ল্যাবরেটরি নেই—মেডিকেল রিসার্চের কথা

তো ভাবাই যায় না। হ্যাঁ, ছেলেদের ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওয়ার্ডে পড়াতে পারেন, কিন্তু তাহলে তো ছেলেদেরও ওই সময় হাসপাতালে আসা বাধ্যতামূলক করতে হয়। ছেলেরা কি সন্ধ্যাবেলায় আসতে চাইবে? আর চিকিৎসার ব্যাপার, এটা যেমন হচ্ছে, ওরা ফুল-টাইমার হলেও একইরকম থাকবে। কোন রকমফের হবে না। একজন অভিজ্ঞ ভিজিটিং ফিজিশিয়ান বা সার্জন সারাদিন তো আর একটা রোগীর কাছে বসে থাকতে পারেন না। তিনি যত কম সময় ধরেই রোগীকে দেখুন, তিনি ঠিকই রোগের ডায়াগনোসিস করেন, আর ঠিক চিকিৎসাই করে থাকেন। রোগী দেখার পর বাকি সময় তিনি হাসপাতালে কি করে কাটাবেন?



এছাড়া, অন্যান্য প্র্যাকটিকাল অসুবিধাও আছে। প্রথমে বেতনের কথাই ধরা যাক। অদ্ভুত ব্যাপার হলো—নন-মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পে-স্কেল রয়েছে, কিন্তু মেডিকেল শিক্ষকদের বেলায় তা নেই। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে কোন কলেজে একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রফেসরের চেয়ে বেশি মাইনে পাচ্ছেন। কিভাবে এটা হতে পারে, তার জবাবে একজন অধ্যাপক জানালেন, স্বাস্থ্য দফতর একটা গোলোকধাঁধা, এখানে সবই হয়। অথচ, এই রাজ্যে লেকচারার হতেই বয়েস পঁয়তাল্লিশের কোঠায় পৌঁছে যায়। এই অবস্থায়, ওরা বললেন, প্র্যাকটিস না করে উপায় কি? ঠাটবাট বজায় রাখার ব্যাপার আছে। একটা গাড়ি মেনটেন করতেই অন্তত পাঁচশ টাকা লাগে আজকের দিনে।

একজন নামী ডাক্তার মনে করেন, সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে দুর্নীতি আরও বেড়ে যাবে। এই ডাক্তাররাই কার্যত কালো টুপি কালো শার্ট কালো চশমা কালো গাড়ি করে প্র্যাকটিস করবেন। যেমন করছেন এখন পি-জির ডাক্তাররা। তিনি জিগ্যেস করলেন—ওরা তো সরকারের নাকের ডগায় বসে প্র্যাকটিস করে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন; সরকার কিছু ব্যবস্থা নিতে পারছেন ওদের বিরুদ্ধে?

ডাক্তারদের দুই সংগঠন 'ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ওয়েসট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' কিন্তু মেডিকেল-শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং করার স্বপক্ষে। অবশ্যই শর্ত রয়েছে। ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ডাঃ মণীশ প্রধান বললেন—মেডিকেল শিক্ষকদের বেতন হারের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তা ইউ জি সি স্কেলের বেতনের অন্তত তিনগুণ হওয়া চাই। বেতনের ব্যাপারে ওরা সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে, অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং প্রফেসর যথাক্রমে ১২৫০-১৮৫০, ১৮৫০-২৫০০, ২৫০০-৩২০০ টাকা স্কেলে বেতন পাবেন। বর্তমানে প্রফেসরের বেতন হার ১৬০০-১৯০০। এই বেতন যতদিন না বাড়ানো হচ্ছে, ততদিন অ্যাসোসিয়েশন ডাক্তারদের সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলবে না বলে ডাঃ প্রধান জানালেন। এছাড়া, সরকারকে দেওয়া অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে, হাসপাতালগুলিতে কাজের উপযোগী সুযোগ সুবিধা বাড়ানো।

ছবি: [illegible]

ওয়েসট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ডাঃ সুজিত দাশ অবশ্য মনে করেন, 'নন-প্র্যাকটিসিং টিচিং সার্ভিসের সিদ্ধান্ত সরকারী একটা 'গিমিক' ছাড়া কিছু নয়। কোন সরকারই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে চায়নি; এই সরকারও চায় না।

ওঁর যুক্তিগুলো এরকম। এক, হাসপাতাল ফ্যাক্টরি নয়, এতে উৎপাদন কিছু হয় না। হাসপাতালের জন্যে সরকার যা ব্যয় করেন, তা থেকে রিটার্ন কিছু নেই। কাজেই সরকারী নীতি হচ্ছে—হাসপাতালের জন্য যত কম পারো খরচ করো। এই নীতির ফলেই সরকারী হাসপাতালগুলোর আজ এই দুরবস্থা। হাসপাতালে বেড বাড়ে না, ওষুধের সরবরাহ বছরের পর বছর একই থেকে যায়। ডাক্তারদেরও নিয়োগ করা হয় যত সস্তায় পারা যায়। অবিশ্যি, ডাক্তারদেরও স্বার্থ আছে। কোন মেডিকেল কলেজের অ্যাটাচমেনট থাকলে ভালো প্র্যাকটিস জমে, তাড়াতাড়ি নাম হয়। এদের কাছে মাইনে বড় ব্যাপার নয়; বড় হলো প্র্যাকটিস। কাজেই সরকার তাদের কত মাইনে দিচ্ছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না।

দ্বিতীয়ত, একটা কায়েমী স্বার্থ হাসপাতালগুলোর বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। ভি আই পি রোগীদের জন্যই ডাক্তাররা বেশি সময় ও মনোযোগ দেন। এমন কি, যে-ওষুধ অন্য রোগীর ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না, তাও ভি আই পির ক্ষেত্রে এসে পড়বে মুহূর্তের মধ্যে। ডাক্তারবাবুকে তোয়াজ করে চলতেই হয়, কারণ তোয়াজ করে না চললে তিনি কলকাতা থেকে বদলি হয়ে যাবেন নর্থ বেঙ্গল বা বাঁকুড়াতে। অথচ, তার প্র্যাকটিস তো এই কলকাতায়। খুব জমজমাট, সদ্য জমেছে বা জমছে—যার ক্ষেত্রে যেমন। এই অবস্থায় তিনি নতুন জায়গায় যেতে স্বভাবতই চাইবেন না। কাজেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি কায়েমী স্বার্থের সেবাদাস। যা হোক, এভাবে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা সিসটেম তৈরি হয়ে গিয়েছে, যাতে ভি-আই পি এবং ডাক্তারবাবু দু'জনেরই লাভ, হঠাৎ যদি ডাক্তার-শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং করে দেওয়া যায়, তবে ভি-আই পি'রাও আর বিশেষ সুবিধা পাবে না। কারণ, তখন ভি আই পিদের ডাক্তাররা আর দশজন রোগীর মতই দেখবেন।

তৃতীয়, হাসপাতালগুলি এখন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-কোন কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে একদিন দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা যাবে। খোদ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলা, এম এল-এ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্তারা প্রত্যহ চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন জনের হয়ে।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোন বিক্ষোভ দেখা দিলে ডাক্তারদের জনসাধারণের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সরকার বিক্ষোভকে পাশ কাটাতে পারেন। কারণ, ডাক্তাররাই 'ম্যান অ্যাট দি কাউনটার'। ডাক্তারদের ওষুধের বন্টন-ব্যবস্থায় কোন ভূমিকাই নেই; অথচ স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মাঝে মাঝে কেমন অনায়াসে ওষুধ চুরির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করে বসেন ডাক্তারকে।

বস্তুত, ডাঃ দাশ মনে করেন—আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন অভিভাবক নেই। সরকার না দেখলেও হাসপাতালগুলি যেমন চলছে, চলবে।

স্বাস্থ্য দফতরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েসট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া নতুন টিচিং স্কিম সরকার গ্রহণ করেছেন। দুই সংগঠনের ডাক্তার প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি 'টাসক ফোরস'-এর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর ১২ মারচের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্কিমটিকে সমর্থন করেন এবং কার্যত মেনে নেন। কিন্তু, ওই পর্যন্তই। স্কিমটি এখনো ফাইল চাপা হয়ে পড়ে আছে। এই লেখার সময় পর্যন্ত স্কিম কার্যকর করার প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরকারী মুখপাত্র অবশ্য জানালেন, ডাক্তার-শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং করা হবেই। কিন্তু সত্যিই হবে কি? সরকার কি সত্যিই মেডিকেল শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং করতে পারবেন? ★

মিছিং সম্প্রদায়ের ভালবাসার গান—ঐ নিতম

নন্দলাল সেনগুপ্ত

ব্রহ্মপুত্র-সমতল, অরণ্য আর পাহাড় দিয়ে প্রকৃতি যেন আসামকে সাজিয়েছে নিজের মনের মতো করে। প্রতি ঋতুতেই আসামে প্রকৃতির রং বদলে বদলে যায় ; প্রকৃতির সেই বর্ণাঢ্য ইশারায় সাড়া দেয় আসামের উপজাতি জনজীবন। নাচে, গানে উৎসবে মাতে তারা। বিভিন্ন উপজাতির উৎসবের রূপ আলাদা আলাদা, বিভিন্ন ঋতুর উৎসবও পৃথক।

আসামের এক উপজাতি সম্প্রদায়—'মিছিং'। অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মত তাদেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। বসন্তে উৎসবে মাতে তারা। গায় 'ঐ নিতমের' গান।

'ঐ নিতম'—মিছিংদের শ্রেষ্ঠ লোক-গীতিকা। যৌবনের প্রেম চেতনা প্রকাশ পায়



'ঐ নিতমের' গানে গানে। শুধু প্রেমই নয়, যৌবনের উদাসী মন যখন অসহনীয় সামাজিক অত্যাচার, অশান্তি, বিরহ ও বেদনার ভরে যায়—তখন মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন 'ঐ নিতমের' সুললিত সুর। 'ঐ নিতম' তাই উদ্বেল তারুণ্যের গান, যৌবনের সপ্রাণ সঙ্গীত।

মিছিং লোকগীতিকার মধ্যে 'ঐ নিতমকে' অসমীয়া বিহুগীতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 'ঐ' শব্দের অর্থ অতি আদরের, 'নিতম' মানে গীত। এই গীত সমূহের ভাবার্থ খুব গভীর। প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তর থেকে নিঃসৃত রূপ-রস-গন্ধে এক স্বর্গীয় সুষমার প্রতিচ্ছবি। তাই 'ঐ-নিতমের' শ্রেষ্ঠ গায়ককে বলা হয় প্রকৃতির কবি।

'ঐয়া মেপায়েমিল
ঐনক গুণ দেম মেপায়োমল
কাপলিং ঐয়া রেঙাদে।'

গানের অর্থঃ 'প্রিয়, যখন তোমার গুণগুলির কথা আমার মনে পড়ে তখন আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে হয়।'

এ গানটি প্রেমিক-প্রেমিকার অকৃত্রিম ভালোবাসারই পরিচায়ক। মৃত্যুর পরেও সে ভালবাসা অম্লান থাকবে এই আশায় 'ঐ নিতমে' গাওয়া হয়ঃ

'চিম্পুম চুলা চিসাংগম
একাস্তিলা দু'মিল
আসজক্তে দুয়রিদে মাপুম
ঐয়া চুয়েপে।'

অর্থাৎ, প্রিয়, তোমার-আমার মৃত্যু এক-সঙ্গে না হলেও তোমার আমার ভালবাসা মৃত্যুর পরেও শ্মশানের দরজা ভেদ করে বেরিয়ে এসে আলিঙ্গন করে আমাদের ভালোবাসার অমরতার সাক্ষ্য দেবে।

অন্য একটি 'ঐ নিতম' গানের কলিঃ

'চিল ঐয়া চিয়েচং
য়াম্প ঐয়া কিনদাং।'

গানের অর্থ, মানুষ মরণশীল। কখন জীবনদ্বীপ নিভে যাবে কে জানে? তাই, প্রিয়, প্রেম-ভালোবাসাকে কেন ত্যাগ করবো বলো? সত্যিকথা এই যৌবন একদিন বৃন্ত-চ্যুত লাউয়ের মতো জীবন থেকে খসে পড়ে যাবে। প্রিয়, বলো তখন কি কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে? তাই দুদিনের এই জীবনে ভালোবাসার বাঁধনকে কেন আমরা ভেঙে চুরে তছনছ করবো?

এইভাবেই প্রেমে পাগল মিছিং-যুবক-যুবতীর হৃদয়ের ভালোবাসা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

'ঐ নিতমের' ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু ভাবার্থ গভীর।

'ঐ কলিয়া কাম্ময়কা
আনে-গঢ়ে ক মাদাপে
আনে গঢ়ে কয়েমিল
ঐকলিন কাপলাংকা।'

অর্থাৎ—হে ঐকলি! (চাতকের মতো এক ধরনের পাখি) বান না আসা পর্যন্ত তুই কাঁদিস না, বান এলেই তুই কাঁদিস।

এ গানের কলিগুলি এক নজরে অর্থহীন মনে হলেও এই গীতের মধ্য দিয়েই মিছিং-যুবক যুবতী বলতে চেয়েছে যে,'তাদের জীবনে এখনও বসন্ত আসেনি। কিন্তু যখনই জীবনে বসন্ত নেমে আসবে তখনই তো প্রেমের বেদনা বিরহের অশ্রু কতো মূল্যবান তা বোঝা যাবে।'

প্রেম-প্রীতির টানাপোড়েন মিছিং-যুবক যুবতীর হৃদয় উদ্বেলিত, এই গানগুলি তাদের উন্মুক্ত জীবনের সুন্দর ভাবরাশির প্রকাশ। উচ্ছল যৌবনের উন্মাদনায় খোলা আকাশের নিচে খোলা মাঠে সবুজ বনের পথে নাচের তালে তালে এই গীতের জন্ম যেন খুবই স্বাভাবিক, অন্তরের অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে মিছিং যুবক যুবতীরা গায় ভালবাসার গান—'ঐ নিতম'। ★

[কৃতজ্ঞতাঃ মিছিং লোকগীতিকা ও আলোকচিত্র সংগ্রহে সাহায্য করেছেন পুণ্যপ্রভা দলে ও ভৃগুমণি কায়সুং]

হিটলারের চশমা

জীবন ভৌমিক

হিটলার কি চশমা ব্যবহার করতেন?

চশমা চোখে নাৎসী নায়ক এ্যাডল হিটলারের কোনও ছবি আজ পর্যন্ত দে যায়নি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হেই লিঙের লেখা থেকে জানা গেছে হিটলার তাঁ জীবনের শেষ দশ বছর চশমা ছাড়া কাগজপ পড়তে পারতেন না। হিটলারের প্র পাওয়ারের চশমা ছিল। তবে তাঁর দৃষ্টিশ যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল একথা হিটলার কখন জারমান জনগণের কাছে প্রকাশ কর দেননি। বাঙ্কারের মধ্যে নিজের ঘরে ব লেখাপড়ার সময় হিটলার তাঁর পকেট থে চশমাটি বের করে নিতেন।

হিটলারের চশমার কথা বাইরের মানুষে কাছে গোপন রাখবার জন্যে এক বিশে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাইরে কোনও ভাষণ প্রদানের পূর্বে হিটলার তাঁ লিখিত ভাষণটি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ি অনেকবার মহড়া দিয়ে নিতেন। ভাষ প্রদানকালীন নাটকীয় ভঙ্গীগুলি অভিনেত মত তিনি আগেই রপ্ত করে নিতেন। ভাষ টাইপ করা কাগজে লেখা। যাতে তিনি খা চোখে দেখতে পান তার জন্যে বড় অক্ষরে এক বিশেষ টাইপরাইটার তৈরি করা হয়েছিল সেই বিশেষ মেশিনে টাইপ করা ভাষণে কাগজটি সামনে রেখে জারমানবাসীদে উদ্দেশ্যে হিটলার তাঁর ভাষণ প্রদান করতেন।

কিন্তু এতেও মুশকিল হতো। কা চোখের সামনে লেখা কাগজ পড়তে যাব সময় অভ্যাসবশত চশমার পকেটে হিটলারে হাত চলে যেত। চশমাটা হাতে উঠে আসত সতর্ক হয়ে গিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে চশ রেখে তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যেতেন। সে বক্তৃতার সময়ে বিভিন্ন আবেগপ্রবণ ও উত্তেজনার মুহূর্তে হিটলারের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসত। চশমাটি ভাঙত আবার নতুন চশমা করিয়ে দেওয়া হতে কারণ চশমা ছাড়া তাঁর লেখাপড়ার ক চলত না। হিটলারের ব্যক্তিগত সচিব নি এইরকম তিরিশটি চশমা ভাঙতে দেখেছেন।

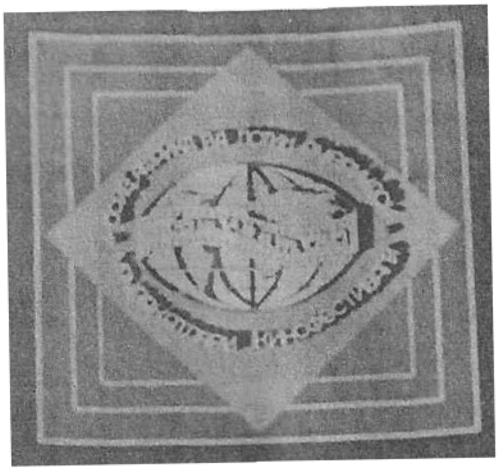
হিটলারের লেখার টেবিলে তিনটি বি রং-এর পেনসিল থাকত। লাল, নীল সবুজ। কখন কোন রং-এর পেনসিল দি লিখতেন বা সই করতেন সেকথা হিটল নিজেই বলে গেছেন। তিনি বলেছে 'কোনও শত্রু বা শত্রুপক্ষ সম্পর্কে লিখতে গে আমি লাল পেনসিল দিয়ে লিখি। বন্ধুদে লেখা চিঠি বা তাদের সম্পর্কে কিছু লেখ সময় ব্যবহার করি সবুজ রং। আর যখ কোনও বিষয়ে নিজের সাবধান হওয়া দরক বলে মনে করি, সেইসব বিষয়গুলি আমি নী পেনসিলে লিখে রাখি।' ★

তাসখন্দ উৎসবে ভারতীয় চলচ্চিত্র

মে মাসের শেষে সোভিয়েত উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বসেছিল ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের আসর। এবারের উৎসবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার ৭৫-টিরও বেশি দেশ যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আফগানিস্তান ভারত, ইরান, বাংলাদেশ, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক, ফিলিপিনস, শ্রীলঙ্কা এবং জাপান। এ পি এনের খবরঃ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং দশটি পুঁজিবাদী দেশের প্রতিনিধিরা উৎসবের অতিথি হিসাবে যোগ দেন।

তাসখণ্ড উৎসবে কামপুচিয়া, কামেরুণ, সেশেলস, নিকারাগুয়া এবং ভেনেজুয়েলার ছবি এবারই প্রথম দেখানো হয়। ছবি বাছাইয়ের মটো ছিলঃ শান্তি, সামাজিক উন্নয়ন ও জাতিগত স্বাধীনতা।

আনতোনিয়া শ্বেদোভার সংযোজনঃ তাসখন্দে চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু ১৯৬৮ সালে।



সেবার প্যালেস অব আরটসে প্রথম উৎসব হয়। গত বারো বছরে তাসখন্দ উৎসবের আকর্ষণ বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে—প্রত্যেক বারেই যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বছরের উৎসবে সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধি এসে ছিলেন ভারত থেকে। ভারতের চলচ্চিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে খুবই জনপ্রিয়। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগল কিংবা বাসু চ্যাটারজির নাম ও দেশে ঘরে ঘরে পরিচিত। সাম্প্রতিক তাসখন্দ এবং আগের মসকো চলচ্চিত্র উৎসবের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের মনে আরো কয়েকজন ভারতীয় পরিচালকের নাম মুদ্রিত হয়ে গেছে। তাঁরা হলেন—বি ভি করন্থ, ডি প্যাটেল, জি কারনাড, এম ম্যাথিউ এবং পি বেকার।

এ বছরের উৎসবে ভারতে তৈরি ২৫টি ডকুমেনটারি ও ফিচার ফিলম দেখানো হয়েছে। দীপ্তি নাভেল অভিনীত 'জাসট ওয়ানস মোর'



তাসখন্দে শ্রীলঙ্কার পরিচালক এইচ ডি প্রেমারত্নের সঙ্গে আলোচনা করছেন ভারতীয় অভিনেত্রী দীপ্তি নাভেল

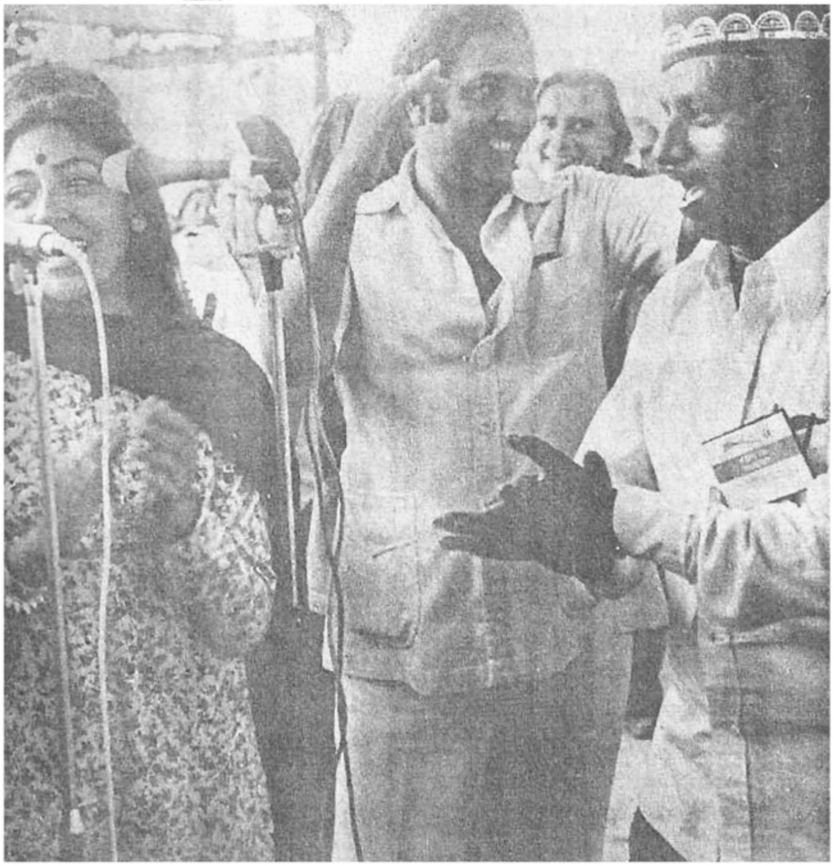


সমরখন্দের এক ছাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় পরিচালক দুবে এবং নৃত্যরত অন্যান্যরা.

ছবিটি তাসখন্দে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। শ্রীমতী নাডেল নিজে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার অর্জন এবং এক বিবাহিতা নারীর প্রেম ও কঠোর জীবন সংগ্রাম এ ছবিকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে।

তাসখন্দ উৎসবে উজবেকিস্তান থিয়েট্রি-কাল সোসাইটির পুরস্কার পেয়েছে ভারতীয় ছবি 'টাচ'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সাই পরাঞ্জপে, প্রযোজনা করেছেন বাসু ভট্টাচার্য। স্বদেশেও ছবিটি সেরা হিন্দি ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল: ইউনাইটেড ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিলম ডিরেকটরসের সভাপতি বাসু ভট্টাচার্য তাসখন্দ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 'টাচ' ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন: এ ছবি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও মানবিক সুখের পন্থা সন্ধানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে তাসখন্দ গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী বসন্ত শাঠে। তিনি ভারতীয় ও সোভিয়েত সহযোগিতায় চলচ্চিত্র তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেন। দু'দেশ মিলেমিশে 'বাবরের' উপর একটি ছবি করবে বলে কথা হয়। বিশিষ্ট ভারতীয় প্রযোজক জে পি সিপ্পিও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান। ★



তাসখন্দের ভারতীয় অতিথিরা তাৎক্ষণিক অভিনয়ের দ্বারা সমবেত অভ্যাগতদের আনন্দ দিচ্ছেন —

বড় ভুল ভেবেছিলেন পেনসিলভেনিয়ার বিশপ। বড় ভুল বলেছিলেন উনি। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াটাই বড়, হারজিতটা নয়—কথাগুলো এখন কেমন হাসি ধরায়। ওলিমপিক নিয়ে যা হয়ে আসছে আর এবারও যা হল তাতে ওই প্রবাদ বাক্যটি মূর্খের প্রলাপ বলে প্রমাণিত। ওলিমপিক—গ্রেটেস্ট শো অন আরথ, ওলিমপিক রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠার আঙিনা।

বাইশতম ওলিমপিকের সাফল্যের জন্য মসকো দাঁতে দাঁত চিপেছে, ব্যর্থ করতে কোমর কষেছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট কারটারের অনুরোধ আর হুমকিতে জল গড়িয়েছে বহু দূর। অনেকেই মসকোয় গরহাজির, অনেকেই বয়কট সমর্থন করেছে, কিন্তু প্রতিযোগীদের যাওয়া আটকাতে পারেনি। নয় নয় করেও মসকোয় এবারে যোগ দিয়েছে ৮১টি দেশ, ১৪৬টি জাতীয় ওলিমপিক কমিটির মধ্য থেকে। সংখ্যাটা নেহাত ফেলনা নয়।

প্রেসিডেন্ট কারটার আফগানিস্তানের ধুয়ো তোলার পর ভেবেছিলেন মসকোয় গরহাজিরার খাতাই বেশি ভারি হবে। কিন্তু ৮১টি দেশের যোগদানের পর মসকো প্রমাণ করল কারটারের কথাই শেষ কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৪৮-এ লনডন, ৫২-তে হেলসিংকি এবং ৫৬-র মেলবোরনে হাজির থাকা দেশের সংখ্যা মসকোর থেকেও কম ছিল। লনডন ওলিমপিকে হাজির ছিল মাত্র ৫৯টি দেশ, হেলসিংকিতে ৬৯ এবং মেলবোরনে ৬৭। ৬০-এর আসর বসেছিল রোমে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৮৪। ৬৪-তে টোকিওয় ৯৪, ৬৮-তে মেকসিকো সিটিতে ১১২। যোগদানকারী দেশগুলির সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মেকসিকো সিটি দ্বিতীয় আসনটি দখল করে। প্রথম স্থানে রয়েছে এখনও পর্যন্ত ম্যুনিক। ৭২-এর আসরে সেখানে যোগ দিয়েছিল ১২২টি দেশ। চার বছর পর মনট্রিয়েলের আসরে সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ৮৮-তে। সুতরাং প্রতিযোগী দেশগুলির সংখ্যার বিচারে মসকোকে হাসাহাসির পর্যায়ে ফেলে দিতে পারেননি মারকিন প্রেসিডেন্ট জিমি কারটার। ড্যাং ড্যাং করে মসকো আসর বসিয়েছে।

কারটারের হুমকিতে অনুপ্রাণিত বেশ কিছু সহযোগী দেশ বয়কটের তালে পা ফেললেও বহু দেশের ওলিমপিক কমিটি বেসুরো গেয়েছে। নিজের দেশের ওলিমপিক কমিটিকে চোখ রাঙিয়ে কারটার রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সফল হলেও বৃটেন, নিউজিল্যানড, অসট্রিয়া, অসট্রেলিয়া, হল্যানড, স্পেন ও ইটালির সরকার ওইসব দেশের খেলা পাগল লোক এবং প্রতিযোগীদের দমাতে পারেনি। সরকারের হুমকিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এইসব দেশের খেলোয়াড়রা মসকোয় ভিড় করেছেন। ওদের প্রেরণা শুধুমাত্র ওলিমপিকের মহান উদ্দেশ্যটুকু, আর কিছু নয়।



ওলিমপিক নিয়ে রাজনীতি এবারেই প্রথম নয়

শাক্যদেব

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওলিমপিক নিয়ে এবারে যে রাজনীতির মারপ্যাঁচটা হয়ে গেল তা কি অভূতপূর্ব? উত্তর নিশ্চয় এক শব্দ এবং বর্ণের—'না'। অনেক দূরের ছবি নাই বা আঁকলাম, ৩৬-এ বারলিনের আসরে কালো ছেলে জে সি ওয়েনসের সাফল্যে 'অপমানিত' হিটলার কি স্টেডিয়াম ছাড়েননি? ৪৮-এর আসরে ইজরায়েলকে বহিষ্কারের দাবি নিয়ে এককাট্টা হয়ে আরব দেশগুলি কি ওলিমপিক বয়কটের ভয় দেখায়নি? ৫২-তে হেলসিংকির আসরেও কি রাজনীতির আঁচ লাগেনি? নাহলে লাল চীনের অন্তর্ভুক্তিতে রেগে লাল হয়ে জাতীয়তাবাদী চীন (তাইওয়ান) ওলিমপিকে যোগ না দিয়ে বেরিয়ে আসবে কেন? ৫৬ ইতিহাসও তো সকলের জানা। হাঙ্গেরিতে রুশ অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে মেলবোরনের আসর বয়কট করেছিল সুইজারল্যানড, নেদারল্যানড ও স্পেন। আর সুয়েজ অবরোধের প্রতিবাদে সিরিয়া, লেবানন, মিশর ও ইরাকও ছিল গরহাজির। ৬০-এ রোম ওলিমপিকে তাইওয়ানকে আবার যোগদানের ডাক দেওয়ায় চীন হাজির ছিল না। ৬৪-তে ইনদোনেশিয়া বহিষ্কৃত হয় টোকিওর আসর থেকে। ৭২-এর ম্যুনিখের আসর ছিল রক্তাক্ত। প্যালেসটিনীয় কম্যানডোদের অতর্কিত গোলাগুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এগারজন ইজরায়েলী অ্যাথলেট। বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে ৭৬-এ মনট্রিয়েলের আসরে একুশটি আফরো-এশীয় দেশ প্রতিযোগিতা বয়কট করেছিল। এসবের রেশ তো টানতেই হবে মসকোকে। ওলিমপিককে ঘিরে রাজনীতির যে অভিশাপ লেগে রয়েছে ৮০ মসকো তা থেকে কি করে বাদ যায়? মসকো তাই ব্যতিক্রম হতে পারল না। আধুনিক ওলিমপিকের জনক প্যারিসের সিংহশাবক ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তঁর চোখ এখন নিশ্চয় ভেজা ভেজা। বিশ শতকের আসরে রাজনীতিকে ওলিমপিক থেকে বাইরে রাখার যে সংগ্রামে কুবার্তঁ জয়ী হয়েছিলেন এবার তা পারলেন না লরড কিলানিন। তবে কিলানিন জোরগলায় বলেছিলেন মসকো ওলিমপিক হবেই। এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত মসকোয় অঘটন কিছু ঘটেনি।

মারকিন শিবির থেকে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে এবারের ওলিমপিক ওলিমপিকই নয়। কারটার মসকোয় মারকিন পতাকা এবং জাতীয় সংগীত বাজানোর অনুমতি দেননি। আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে মসকোয় আসছেনা চীন, পশ্চিম জারমানি, জাপান ও কানাডা। এতে ক্ষতি বিশ্বের খেলা পাগল মানুষের এবং ওলিমপিকের নিজের। তবু এটুকু বলা যায়, মনট্রিয়েলের আসরে ৭০ শতাংশ সোনা জয়ী দেশগুলি মসকোয় হাজির হয়েছে। সেদিক দিয়ে এবারের আসর নেহাতই ছেলেভুলানো নয়।

রাশিয়াই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ যে ওলিমপিক আসরের দায়িত্ব পেয়েছে। মারকিন বিরোধিতায় স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক শিবির তাই এই ব্যাখ্যাই দিতে চাইবে যে, আফগানিস্তান অজুহাত মাত্র, আসল কারণ হল সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্যে গাত্রদাহ। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাই এ ধরনের বিরোধিতার আশংকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংশয়ের খচখচানি এখান থেকেই শুরু। পরবর্তী আসর লস এনজেলেসে ৮৪-তে। সেখানেও যে এমন ভাঙা হাটের পসার বসবে না তার কোনও গ্যারানটি কি আগাম দেওয়া যায়? নিশ্চয় নয়। তবে এটুকু বলা নিশ্চয় যায়—ওলিমপিক আন্দোলন হয়ত এভাবেই ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাবে। আজ নয় কাল। ★

চিত্র প্রদর্শনী

কিছু অলংকৃত পট

এপ্রিলের দ্বিতীয় পক্ষে আলিয়াঁজ ফ্রানসের অলিন্দে অসিত মণ্ডলের চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে। তাঁর শিল্পশৈলীর প্রথম লক্ষণ অলঙ্করণ। অলঙ্করণের মাত্রা রক্ষা করেছেন মোটামুটি, আতিশয্য ঘটেছে কখনো সখনো। কিন্তু ভারি সোনার অলঙ্কার নয়। সূক্ষ্ম কাজের ধাঁচ বজায় রেখেছেন। বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন মহাকাব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যান থেকে। চিত্রকে অলঙ্কার প্রধান করার এটা অন্যতম কারণ। প্রকৃতি —ফুল লতা ও প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-কলার প্রকরণ ও নকশাকে বিন্যস্ত করেছেন সযত্নে। চিত্রগুলির অঙ্গসজ্জার মধ্যে কিছুটা একঘেয়েমি আছে। শকুন্তলার ছবিটি গাঢ় সবুজ। ঘনবদ্ধ নকশাকাটা। রূপরেখার বৈপরীত্য ছবিটিকে আড়ষ্ট করেছে।

সবুজ নীল ও কমলালেবু রঙের পুষ্পময় অরণ্যদেব [কমিকস-এর সর্ব-শক্তিমান অরণ্যদেব নয়] চমৎকার।

প্রধানত নীল রঙে আঁকা বাগানে বিশ্রামরত বাবুটি উনিশ শতকের। ড্রইং সিরিজের ড্রিম অব দ্য প্রিনসেস ছবিটির উপরিভাগে একটি ঘড়ি। দুর্বোধ্য প্রতীক। ঘোড়সওয়ার, রাজকুমার, সাদা কালোয় শিকারী ভয়েজ, কিং অব ইনসেক্টস ইত্যাদিতে অঙ্কনকুশলতা আছে।

নিজস্ব স্বচ্ছ প্রয়োগরীতির সঙ্গে অঙ্কনদক্ষতা অসিত মণ্ডলের চিত্রকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। প্রাচীন উপাখ্যানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। ঐতিহ্যকে স্বপ্রকাশ করতে হলেও নতুন পথের অনুসন্ধান প্রয়োজন।

কৈশোরক

আকাডেমির নতুন গ্যালারিতে সুকুমার শিল্প নিকেতনের ছাত্রদের ছবির প্রদর্শনীতে (১২-১৮ মে) স্কেচ, ড্রইং তেলরঙ পেনসিল কালিকলম ও রঙিন খড়ির আঁকা শতাধিক ছবির অধিকাংশ শিল্পী কৈশোর অতিক্রম করেনি। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে পড়ে। ছবি আঁকা শেখার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানে জমায়েত হয়েছে। হুটোপাটি ছোটাছুটি করে অসংখ্য ছেলেমেয়েরা ছবি দেখছে। একপাশে হৈ-হৈ করে রবারের বল নিয়ে খেলছে কয়েকটি ছেলে।

অনেক কিশোর শিল্পী গণেশের মূর্তি এঁকেছে। গণেশের রূপ যে কমিক। পেটটি মোটা গণেশদাদা।

জলরঙে নিসর্গ চিত্রের সংখ্যাই বেশি। নদী পাহাড় গাছগাছালি। পুরীর সমুদ্রতীর। পেনসিল ও কালিতে স্টিল লাইফ, মাছ, পাখি, মুখোশ, পোট্রেট ইত্যাদি হরেকরকম ছবি।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের চিত্রপ্রদর্শনী নিয়ে অনেক বিদ্রুপ করে। তারা বলেন, কেউ কেউ কবি, শিল্পী বা গায়ক হয় সবাই নয়। ঠিকই, কিন্তু অন্যদের মধ্যে অবশেষের রেশ থেকে যায়।

প্রণব নাগ

নাট্য-সমীক্ষা

মৃতের মিছিল

প্রযোজনা : অভ্যুদয়। **পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা :** কিরণ মৈত্র। **আলো :** অমিয় সেন। **শব্দ :** পূর্ণেশ ধর। **রূপ ও সজ্জা :** নীহার পোদ্দার। **মঞ্চ :** ত্রিদীপ চ্যাটার্জি। **অভিনয় :** বিজন থিয়েটার, ১৩ জুন ১৯৮০।

মৃতের মিছিলে যোগদানকারী সকলেই আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে মূলধন করেই গড়ে উঠেছে 'মৃতের মিছিল' নাটক। স্বভাবতই হতাশা আর প্রবঞ্চনা নাটকের সিংহভাগ দখল করেছে। কিন্তু তার মধ্যেও নাট্যকার অজয় চরিত্রের মাধ্যমে আশার আলো দেখাতে চেয়েছেন।

এ ধরনের নাটকে অনেক চরিত্রের ভিড় থাকায় নাটক জটিল এবং নাটকের গতি শ্লথ হতে পারে। প্রথম সমস্যাটিকে নাট্যকার সুন্দরভাবে এড়িয়ে যেতে পারলেও দ্বিতীয় সমস্যাটি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। গতি মন্থরতা মাঝে মাঝেই দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।

সুন্দর অভিনয় করেছেন কিরণ মৈত্র, স্বপন মৈত্র, দিলীপ দে এবং মালা বন্দোপাধ্যায়। কয়েকটি অতি নাটকীয় মুহূর্ত বাদ দিলে শান্ত সান্যালের অমূল্য যথাযথ। হিরণ মৈত্রের সত্যেন অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। তপন রক্ষিতের সঞ্জয় আরও স্বাভাবিক হবার প্রয়োজন ছিল। ছোট চরিত্র জীবনের ভূমিকায় পল্টু চৌধুরী সুন্দর। মঞ্চ ও আলো যথাযথ।

উত্তম বসু

কলকাতার অতিথি আমজাদ হোসেন

সন্ধানী

বয়স তিরিশের ঘর পেরোয়নি। চেহারা অবশ্য পড়তির দিকে। চৌকো মুখ। গায়ের রংটাই বলে দেয় তিনি প্রচণ্ড খাটতে পারেন।

না খেটে অবশ্য উপায়ও নেই। মাত্র সাত বছরের মধ্যে তিনি ন-নটি ছবি করেছেন। এখন আনডার-প্রোডাকশন দুটো। তার ওপর আবার বছর বছর ঈদের সময় বিভিন্ন পত্রিকার জন্য উপন্যাস-গল্প-কবিতা লেখার ফরমায়েসও ফেলতে পারেন না সবাই-ই বন্ধু যে!

ঢাকার এই তামাটে তরুণ আমজাদ হোসেন এককথায় কবি-ঔপন্যাসিক গল্পকার-চিত্র পরিচালক-অভিনেতা সব স-অ-ব। সম্প্রতি তিনি কলকাতা ঘুরে গেলেন। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর নতুন ছবি 'গোলাপী এখন ট্রেনে'-র একটি প্রিনট।

১৯৭৯ বাংলাদেশ জাতীয় পুরস্কারের ১৬টি বিভাগের মধ্যে ১১টি পুরস্কার জিতেছিল এই ছবি। আমজাদ হোসেনের 'গোলাপী…' এখন নাকি ওপার বাংলার একটি জনপ্রিয় নাম। ঢাকা শহরে মুখে মুখে নাকি ছড়িয়ে আছে, 'গোলাপী…গোলাপী।'

অবশ্য আমজাদের এই সাফল্য হঠাৎ পাওয়া নয়। হাতেখড়ি হয়েছিল সাহিত্যের আঙিনায়। জন্মভূমি জামালপুর থেকে এই কলকাতার একটি নামী সাহিত্য পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়েছিলেন সাতান্ন সালে, ছাপাও হয়েছিল। উৎসাহে ঘৃতাহুতি পড়ল তখনই। গল্প উপন্যাস-নাটকেও হাত দিলেন। ফিলম প্রযোজকদের কাছে আমজাদ হোসেনের লেখার কদর আছে। ওঁর 'ধারাপাত' নাটক নিয়ে ছবি করেছেন সালাহউদ্দিন, 'নিরক্ষর স্বর্গে' কাহিনী নিয়ে 'নয়নমণি' ছবি হয়েছে। জহির রায়হানের সঙ্গে 'জীবন থেকে নেয়া' ছবির সংলাপ লিখেছেন। মৌলিক রচনায় তাই ভাঁটা পড়ল অল্প কদিন বাদেই।

চিত্রনাট্য আর অন্যের ছবির সংলাপ লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিরিশের তরুণ আমজাদ হোসেন। ফকরুলের 'মানুষ অমানুষ', খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ', 'সুজন সখী' আরও অনেক। একই সঙ্গে চলেছিল অভিনয়। হাসতে হাসতে বললেন—'একসময় ছিলাম সুপার স্টার।'

'জুলেখা' ও 'আগুন নিয়ে খেলা' ছবিতে সহ পরিচালক থাকার পর আর তিনি পরাধীন থাকতে চাইলেন না। শুরু হল স্বাধীন পরিচালক আমজাদ হোসেনের জয়যাত্রা।

কিন্তু তিনি পারলেন না ব্যবসায়িক গণ্ডীর বাইরে যেতে। পরপর তিনটে ছবিতেই (বাল্যবন্ধু, পিতাপুত্র ও এই নিয়ে পৃথিবী) আমজাদ হোঁচট খেলেন। ফরমুলাকে আশ্রয় করে তিনি বাঁচার চেষ্টা করলেন। 'বাংলার মুখ' ছবি থেকে আমজাদ হাজির হলেন নতুন চেহারায়।

তিনি বললেন—'ফিলম একটা দারুণ পাওয়ারফুল মাস মিডিয়ম। আমাদের মত অনুন্নত অশিক্ষিত লোকদের দেশে সমাজ গঠনে, শিক্ষার প্রসারে ফিলম গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে পারে।' তাঁর 'নয়নমণি' নাকি ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল বলে সেনসর আটকে দিয়েছিল। 'সুন্দরী' ছবিটিও রাজনৈতিক কারণে সেনসর কর্তৃপক্ষের লাল-চোখ দেখেছিল। নতুন ছবি 'গোলাপী…' নিয়েও ঝামেলা কম হয়নি। দিল্লির আন্তর্জাতিক উৎসবে আসতে দেয়নি, রিলিজ নিয়ে ঝঞ্ঝাট করছে। আমজাদ সাহেব জানালেন—'আমার এই ছবি নিয়ে কাগজে কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, মন্ত্রিসভায় বিতর্ক উঠেছে। কি হয়নি।'

ওঁর কথায় বুঝলাম তিনি এখন বাংলাদেশের একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। অন্ততঃপক্ষে সিনেমা জগতে তো বটেই। 'পরিচালকের ছবি' এই শব্দটাই নাকি ঢাকায় আমদানী করেছেন তিনি।

বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে তিনি আশাবাদী নন। বললেন— পরিচালক কই? ইনটেলেকচুয়াল পরিচালক বলতে আছেন কবির আনোয়ার, আলমগীর কবির আর সুভাষ দত্ত। ব্যবসায়ে সফল পরিচালক মাত্র একজন—কাজী জহির। সেই কারণেই কি আমজাদ সাহেব নিজের কাঁধে কিঞ্চিৎ বোঝা তুলে নিয়েছেন? সামাজিক সচেতন ছবি তৈরির বোঝা। হবেও বা।

ঋত্বিক ঘটকের সমাজ চেতনা তাঁকে হনট করে, আর সত্যজিৎ রায়ের শিল্প মাধুর্য করে বিচলিত।

এখন তিনি ব্যস্ত 'কষাই' নামের একটি ছবি নিয়ে। বাস্তব জীবনের চরম সত্যগুলোকে তিনি ধরতে চান। শীর্ষেন্দুর 'কাগজের বৌ' নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কলকাতার স্বল্পকালীন অবস্থানে আমজাদ বুক ভরে দক্ষিণী ছবি দেখেছেন; আর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলেছে নানা জায়গায় ম্যারাথন আড্ডা। আমজাদ সাহেব বিশ্বাস করেন—'আড্ডাবাজ না হলে কাজ করা যায় নাকি?' ★

আগস্ট ১ থেকে ১৫

মেষ ঃ শরীর ভালো-মন্দ মিলিয়ে চলবে। আর্থিক ইঙ্গিত শুভ হলেও ব্যয়ের চাপ পক্ষ জুড়ে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা। মেয়েদের কর্মস্থলে আপাতত স্থিতাবস্থা চলবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারও ওপরে বিশেষ আস্থা ক্ষতির কারণ হবে। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে জটিলতা ও অশান্তি। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে কোন নতুন যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আশা ভঙ্গ।

বৃষ ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া যাবে না। আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি। কর্মস্থলে কারও মত বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা সক্রিয় হবার চেষ্টা করবে। বকেয়া টাকার আংশিক উদ্ধার আশা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানের ইংগিত। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানির আশংকা; বিশেষত আগুন থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ বিশেষ লাভজনক নয়। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নতুন কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য।

মিথুন ঃ শরীর ভালো চলবে। আর্থিক অবস্থার আগের চেয়ে বিশেষ উন্নতি। কর্মস্থলে পরিবর্তনের কোন সুযোগ আসতে পারে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কারও সঙ্গে মনান্তর। আয় বৃদ্ধির সুযোগ আসবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে জমিজমা, সম্পত্তিগত ব্যাপারে পূর্ব বিরোধের অবসান। স্বামী/স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় কোন কাজে সাফল্য। ছোটখাটো ভ্রমণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মনোকষ্ট।

কর্কট ঃ শরীর নিয়ে ঝামেলা চলবে। নাক, কান বা গলার কোন পীড়া বেশ বিপাকে ফেলতে পারে। আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। কর্মক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা চললেও পক্ষ মাঝামাঝি নিজ কোন প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। মেয়েদের কর্মস্থলে উর্ধ্বতন কারও সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। নানা ভাবে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে বিরোধ। কর্মহীনদের পক্ষ শেষের দিকে নতুন কোন যোগাযোগের ইঙ্গিত। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

সিংহ ঃ উৎপাত করবে শরীর। ছোটখাটো অসুস্থতা উপেক্ষার নয়। আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়। কর্মস্থলে স্বীয় কোন প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভে বাধা। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা গোপনে সক্রিয় হবে। আয় বৃদ্ধির সুযোগ নেই। সন্তানদের কারও জন্যে দুশ্চিন্তা। কোন দূর আত্মীয় বিয়োগের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ক্ষতি।

কন্যা ঃ শরীর ভালো চলবে না। দুর্ঘটনা ঘটবার আশংকা। আর্থিক অবস্থার অবনতি, ভালো মত ঋণ হতে পারে। কর্মস্থলে উটকো ঝামেলা বেশ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। পারিবারিক ক্ষেত্রে বন্ধুদের সাহায্যে কোন পুরনো সমস্যার সমাধান। পুত্রদের কর্মে সাফল্য। মেয়েদের কোন ব্যাপারে দুর্নাম। ফাটকা বা জুয়া খেলায় ক্ষতি। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয়ের সহজ সুযোগ আসবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশংকা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

তুলা ঃ শরীর আগের তুলনায় ভালো চলবে। আর্থিক ইংগিত শুভ; সঞ্চয় আশা করা যায়। কর্মস্থলে নানান বাধা বিপত্তির মধ্যে স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি। আশানুরূপ আয় বৃদ্ধিতে বাধা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় ভুল বুঝতে পারে। ব্যবসায়ীদের আর্থিক অনটন। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার সম্মান।

বৃশ্চিক ঃ শরীর মানসিক অশান্তির কারণ হবে। আর্থিক অবস্থার ক্রমিক উন্নতি। সঞ্চয় হবার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে নানান বাধায় মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মোটামুটি আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না: রক্তপাত হবার আশংকা। ভৃত্যদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের আরও কিছুকাল মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে বাধা।

ধনু ঃ শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই কিন্তু চলাফেরায় সাবধান। আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি আশা করা যায় না। সঞ্চিত অর্থ ভালোমত ব্যয় হবার আশংকা। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে ঝামেলা চলবে। মাঝে মধ্যে অল্পবিস্তর আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে লাভ হবার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগের আশংকা। সন্তানদের সময় শুভ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আর্থিক ক্ষতি

মকর ঃ মাঝে মধ্যে উৎপাত করবে স্বাস্থ্য। আর্থিক অবস্থার খুব একটা হেরফের হবে না। ব্যয়ের চাপ পক্ষ জুড়েই চলবে। কর্মস্থলে হঠাৎ কোন পরিবর্তনের ইংগিত। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সংযমের অভাব হেতু ক্ষতির আশংকা সামান্য আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সহজ সমাধান অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে সংকেত কোন যোগাযোগ পক্ষ মাঝামাঝি চূড়ান্ত করা যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য দুশ্চিন্তা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার গঠনমূলক কাজে সাফল্য

কুম্ভ ঃ শরীর খুব একটা ভালো চলবে না আর্থিক অবস্থার অবনতি ঋণ হতে পারে ভালোমতন। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চললেও শত্রুদের তৎপরতা বাড়বে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে স্বীয় ভুলের জন্য অনুতাপ। আয় বৃদ্ধির ক্ষীণ সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য, কলহ। বন্ধুদের পরামর্শ কোন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ মানসিক অশান্তি। কর্মপ্রার্থীদের নতুন যোগাযোগ এলেও ফলবতী হবে না। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

মীন ঃ আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতি। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন। সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় থাকবে। মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ উদ্যমের স্বীকৃতি। আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারও জন্য মানসিক উদ্বেগ। দূর কোন আত্মীয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি। সন্তানদের কর্মে সাফল্য। বন্ধুরা কোন ক্ষেত্রে ভুল বুঝতে পারে। স্ত্রীর সংগে সামান্য বিষয়ে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের আপাতত মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আর্থিক ক্ষতি।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৬১৬, ২৭-২৯৬৯), থেকে প্রকাশিত

দস্যু মোহন ৭

মূল কাহিনী : শশধর দত্ত ◆ চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস



PARIBARTAN, 1 August 1980, Registration No 32815 78, Postal Registration No. WB CC 380, Rs. 1.50



বাংলাদেশের শামপান/ আলোকচিত্র : অনীলবরণ